গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

ডিজিটাল বুলেটিন - ১৫ | www.ganadabi.com | ২০ আগস্ট ২০২০

মহান এঙ্গেলস স্মরণে

বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে ১২ আগস্ট দলের শিবপুর সেন্টারে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ

প্রশান্ত ভূষণের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রায় প্রত্যাহারের দাবি

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৫ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন,

আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ করছি, সুপ্রিম কোর্ট তার নিজের ন্যায়পরায়ণতা ও নৈতিকতার উপর এতটাই আস্থা হারিয়ে ফেলেছে যে, একজন খ্যাতনামা আইনজীবীর করা দু'লাইনের একটি মন্তব্য (টুইট)-কে সুপ্রিম কোর্টের মান-মর্যাদার ওপর আঘাত হিসাবে গণ্য করছে। যখন জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং নাগরিক স্বাধীনতা হরণের অসংখ্য জরুরি মামলা দীর্ঘ দিন ধরে সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন হয়ে পড়ে আছে, সেই অবস্থায় তিন বিচারপতির বেঞ্চ যে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় এই স্বতঃপ্রণোদিত (সুয়ো মোটো) আদালত অবমাননা মামলার শুনানি করে রায় ঘোষণা করেছে, তা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার বদলে বহু প্রশ্ন তুলেছে।

বস্তুত, শীর্ষ আদালতের বিচারপতিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নতুন কিছু নয়। প্রশান্ত ভূষণ বেশ কয়েক বছর আগেই এই অভিযোগ তুলেছেন এবং আদালতও তাতে কোনও বিদ্বেষমূলক আচরণ খুঁজে পায়নি। তাহলে এখন কেন পাচ্ছে? তা কি এই কারণে যে, এই সৎ ও নির্ভীক আইনজীবী প্রতিটি অবিচারের ঘটনার সুবিচারের জন্য লড়াই করে চলেছেন এবং প্রতিবাদের কণ্ঠ তুলে ধরছেন? আমরা স্পষ্ট বলতে চাই, বর্তমানে যেখানে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করা হচ্ছে এবং ফ্যাসিবাদী কায়দায় বাকস্বাধীনতার কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে, সেখানে সুপ্রিম কোর্টের এই রায় স্বৈরাচারের শক্তিকেই বলবান করবে।

আমরা প্রশান্ত ভূষণের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার এই রায় প্রত্যাহারের দাবি করছি এবং মনে করি, তাঁকে কোনও শাস্তি দেওয়াই উচিত নয়।

শোষণে রিক্ত-নিঃস্ব দেশই কি প্রধানমন্ত্রীর 'আত্মনির্ভর' ভারত!

সেই ১৯৪৭ থেকে ৭৪টা ১৫ আগস্ট পার করেছে এই ভারত। স্বাধীনতা প্রাপ্তির মধ্যরাতে ভারত শুনেছিল দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর সেই বিখ্যাত ভাষণ, 'ট্রিস্ট উইথ ডেসটিনি'— নিয়তির সাথে মিলনের পথে এগিয়ে চলেছে দেশ।

৭৪তম স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লার প্রাচীর থেকে আর এক প্রধানমন্ত্রীর কথা শোনবার সময় প্রশ্ন জাগে, কোটি কোটি রিক্ত-নিঃস্ব-অভুক্ত মানুষের হাহাকারের মধ্যে স্বাধীনতা দিবস পালনের সমারোহই কি নিয়তি ছিল এই ভারতের! স্বাধীন দেশের এই রূপ যে হতে পারে তা নিয়ে বহু আগেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, শহিদ ভগৎ সিং, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মতো আপসহীন বিপ্লবীরা। ব্রিটিশের দাসত্বশৃঙ্খল যদি বা মোচন হয়, দেশের আপামর জনসাধারণের পায়ে বেড়ি পরাতে চায় দেশীয় পুঁজিপতি শ্রেণি। তাঁদের এ হুঁশিয়ারি আজ অতিপ্রকট সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। এসেছে স্বাধীনতা, আসেনি শত শত বীর শহিদের স্বপ্নে দেখা গণমুক্তি। ৭৪ বছরের স্বাধীন ভারতে প্রায় ৯৬ কোটি ভারতবাসী মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যা অর্জন করেন, সেই মোট সম্পদের চারগুণের বেশি প্রতি বছর জমা হয় মাত্র ১ শতাংশ ভারতবাসীর সিন্দুকে। ১৩০ কোটি জনগণ যা উৎপাদন করে তার ৭৩ শতাংশ ভোগ করে মাত্র ১ শতাংশ ধনকুবের। করোনা মহামারি এই জানা সত্যটাকেই আবার নতুন করে দেখিয়ে দিয়ে গেছে যে, দেশের কোটি কোটি মানুষের থাকার মতো কোনও ঘর নেই। প্রতিদিন শ্রমের বাজারে নিজেকে নিঙড়ে নিঃশেষে বিক্রি করতে না পারলে একটা অতিরিক্ত খাবারের দানাও তাদের কাছে মজুত থাকে না। দেখিয়ে দিয়েছে কাজের খোঁজে হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে স্টেশনের শেডে, বাসস্ট্যান্ডের গুমটিতে, বস্তির ঘুপচি ঘরে গাদাগাদি করে যারা রাত কাটায়, যাদের শ্রমে আকাশ ফুঁড়ে ওঠে ইমারত, আধুনিক ব্রিজ, মসৃণ হাইওয়ে— বিপর্যয়ের দিনে স্বাধীন দেশের সরকার তাদের কথাটা একবার মনেও আনতে চায় না। হাজার হাজার মাইল পথ হেঁটেই তাদের ঘরে ফেরার চেষ্টা করতে হয়। রাস্তায় তারা মরে ট্রেনের ধাক্কায়, ট্রাক চাপা পড়ে, না হলে তীব্র গরমে পিপাসার জলটুকু না পেয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে।

এই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৭৪ বছরের স্বাধীন ভারতকে আত্মনির্ভর হওয়ার ডাক দিয়েছেন। কোন ভারতকে? যে ভারতের কর্মক্ষম (১৫ থেকে ৬০ বছর বয়সের) ৯৭ কোটি মানুষের মাত্র ৪৯ শতাংশ কিছু কাজ করে পেট চালানোর অন্তত একটা চেষ্টা করতে পারে। বাকি ৫১ শতাংশের সেটুকু সুযোগও নেই। উঞ্ছবৃত্তি, ভিক্ষাই তাঁদের অনেকের সম্বল। তাও এ হিসাব ছিল করোনা মহামারি পর্বের আগে। তার পরের চিত্রটা আরও সঙ্গীন। সরকারি মতেই কমপক্ষে ১৪ কোটি কর্মরত মানুষ কাজ হারিয়েছেন। আত্মনির্ভর! বড় নির্মম শোনায় কথাটা, যখন কলকারখানা, খনি, নির্মাণ প্রজেক্টের কাজ হারানো লক্ষ লক্ষ শ্রমিক তাদের পরিবার নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে, একটা বিপিএল কার্ডের কিছু সামান্য চাল-গমের আশায় শাসক দলের নেতাদের পায়ে ধরে। এঁরা তো আত্মনির্ভরই ছিলেন— প্রধানমন্ত্রী! আপনিই বলুন, কেন এমন ভিক্ষাবৃত্তির জীবনে এঁদের যেতে হল? কে, কোন নীতিতে এঁদের এই সর্বনাশের দিকে ঠেলল? লালকেল্লার ভাষণে তার উত্তর কোথায়?

তা হলে কেমন আত্মনির্ভর হবে ভারত? প্রধানমন্ত্রী বলে দিয়েছেন 'ভোকাল ফর লোকাল' হতে হবে। অর্থাৎ দেশীয় জিনিস

দুয়ের পাতায় দেখুন

রক্তে রাঙা ১৯ আগস্ট ১৯৮৩

'...এমন সময় গর্জে ওঠে মানতে হবে দাবি
কি অপরূপ এই যে মানুষ, সবাই যখন মেলে
রূপ দেখে তার আঁখি পাগল, তাই চলি ভিড় ঠেলে
দাবির পরে দাবি আসে ঢেউয়ের পরে ঢেউ
ঢেউয়ের মাথায় মানিক জ্বলে ঝান্ডা হাতে কেউ'

১৯৮৩। পরিবহণের ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে উত্তাল পশ্চিমবাংলা। তৎকালীন রাজ্য সরকারের জনবিরোধী পরিবহণ নীতির বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে উত্তাল গণআন্দোলনের ঢেউ। সেই ঢেউয়ে আন্দোলিত হল ঝাড়খণ্ড সীমান্তের পুরুলিয়া জেলা। সারা রাজ্যের মতো এ জেলার মানুষও সামিল হলেন বর্ধিত ভাড়া বয়কট, অবরোধ, ডেপুটেশন, বিক্ষোভ, সভা, মিছিলে।

১৯৮৩ সালের ১৯ আগস্ট। এস ইউ সি আই (সি) দলের আহ্বানে সারা বাংলা জুড়ে সংগঠিত হল প্রতিবাদ, বিক্ষোভ। পুরুলিয়া জেলার কুড়িটি জায়গায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমবেত হলেন সাধারণ

রঘুনাথপুরে শহিদ স্মরণ। ১৯ আগস্ট

মানুষ, মালিক তোষণকারী পরিবহণের অন্যায় ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে। রঘুনাথপুর শহরে সংগঠিত হল বিশাল গণবিক্ষোভ। দাবি নিয়ে

তিনের পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীর ‘আত্মনির্ভর’ ভারত

একের পাতার পর

কেনার জন্য গলা ফাটাতে হবে সবাইকে। তা হলেই আত্মনির্ভর হয়ে যাবে ভারত। কিন্তু প্রশ্ন হল কে কিনবে? সেই প্রশ্নের সাথেই তো জড়িয়ে আছে, কী তৈরি হবে, সেই প্রশ্নের উত্তর! তবেই তো খুলবে কলকারখানা, উৎপাদন হবে, কাজ মিলবে। দেশের ৮০ কোটি লোকের তো একটু চাল-গম কেনারই পয়সা নেই। সে জন্যই তো প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় জোর দিয়ে বলতে হয় ৮০ কোটি মানুষকে বিন্যমূল্যে খাদ্য দিয়ে কৃতার্থ করেছেন তাঁরা। এই বিশাল জনগোষ্ঠী যে পেট ভরানোর মতো একটু খাদ্য ছাড়া বিশেষ কিছু কেনার মতো অবস্থাতেই নেই, প্রধানমন্ত্রী কি সেই খোঁজ রাখেন? তা হলে কী তৈরি হবে, আর তা কিনবেই বা কে? প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, পরিকাঠামোয় ১০০ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ আসবে এবং তা ৭ হাজার প্রকল্পে ঢালা হবে। কী হবে তাতে? কিছু ঝাঁ-চকচকে রাস্তা, ব্রিজ, আকাশচুম্বী ফ্ল্যাটবাড়ি হতে পারে। কিন্তু সে রাস্তা কিংবা ব্রিজে চলতে গেলে বেসরকারি পরিকাঠামো নির্মাতা কোম্পানির লাভের ভাঁড়ার ভরাতে যে পরিমাণ টোল ট্যাক্স গুনতে হবে, তা দেবার ক্ষমতা থাকতে হবে তো! কজনের তা আছে? ফ্ল্যাটের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। এর সাথে হবে ‘মাল্টি মোডাল কানেক্টিভিটি’। নাম শুনেই মূর্ছা যাবার জোগাড় সাধারণ মানুষের। কী সেটা? গ্রামে গ্রামে পাতা হবে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল, ইন্টারনেট সংযোগ। তাই দিয়ে চাষি নাকি সারা দেশের বাজারের সাথে যোগাযোগ করে ইচ্ছামতো পণ্য বেচতে পারবেন, গ্রামের ছেলেমেয়েরা ইন্টারনেট ব্যবহারে দক্ষ হয়ে উঠবে। ইন্টারনেট আধুনিক জীবনের একটি অংশ, তাতে আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু যে গ্রামে পানীয় জল পাওয়াটাই সংকটের, রোজগারের যা হাল তাতে যাতায়াত কিংবা কৃষিপণ্য নিয়ে যেতে কোনও পরিবহণ ব্যবহার করাই গ্রামের মানুষের কাছে দিন দিন কষ্টকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সেখানে এই সংযোগ লাভ দেবে কাকে? এতে রিলায়েন্স জিও মালিকের সেবাদাস হিসাবে প্রধানমন্ত্রী তাঁর কর্তব্য সম্পাদনার গৌরব দাবি করতে পারেন। দেশি-বিদেশি বড় পুঁজি যারা কৃষিপণ্যের পাইকারি এবং খুচরো ব্যবসাকে পুরোপুরি কব্জা করতে চাইছে, তাদের পৌষমাস আসতে পারে, ফাটকার বাজারকে গ্রামের চাষের খেত পর্যন্ত বিস্তারের সুবিধা হতে পারে। কিন্তু অন্য দিকে বেশিরভাগ ক্ষুদ্র-মাঝারি চাষির জীবনে নেমে আসবে সর্বনাশ। তাঁরা স্বাধীন চাষির বদলে পরিণত হবেন বড় বড় কোম্পানির দাদন নেওয়া খাতকে। ওই সব কোম্পানিকর্তাদের ইচ্ছাতেই চাষির জীবন নিয়ন্ত্রিত হবে। আত্মনির্ভরই বটে!

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর নিদান, ডিজিটাল স্বাস্থ্য কার্ড। তাতে কে কবে কোন ডাক্তারকে দেখিয়েছে থেকে শুরু করে কী ওষুধ খেয়েছে, সব নথিভুক্ত থাকবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় স্বাস্থ্যমিশনই হোক আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যসাথীই হোক, সেগুলি আদতে স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যবসারই তো নামান্তর। সরকারি উদ্যোগে সকলের সুচিকিৎসা পাওয়ার অধিকারকে এড়িয়ে গিয়ে মানুষকে বেসরকারি নার্সিং হোম, কর্পোরেট হাসপাতালের থাবার মুখে এগিয়ে দেওয়ার জন্যই যে কল্যাণের আড়ালে এই প্রকল্পগুলি আনা হয়েছে তা আজ বুঝতে অসুবিধা নেই। বেসরকারি নানা বিমা কোম্পানি এই সব প্রকল্পে খুব উৎসাহী। স্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞ সেজে কর্পোরেট হাসপাতালের মাইনে করা প্রতিনিধিরাও এই নিয়ে জ্ঞানগর্ভ বাণী দিতে কার্পণ্য করছেন না। এর ফলে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষিত তথ্য নিয়ে স্বাস্থ্যবিমা, ওষুধ কোম্পানি, মার্কেটিং কোম্পানি, হাসপাতাল নামক স্বাস্থ্য ব্যবসার রাঘব-বোয়ালদের খুব সুবিধা হবে। মার্কেটিং এজেন্সিকে পয়সা দিয়ে তাদের যে তথ্য কিনতে হত, তা সরকারের ঘর থেকেই স্বল্পমূল্যে তারা পাবে। দেশের মানুষের চিকিৎসার কোনও সুরাহা এতে হওয়ার নয়।

তবে কোন আত্মনির্ভর ভারতের কথা বলে গেলেন প্রধানমন্ত্রী? এর আগে তিনি বলেছিলেন ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’। মানে ভারতে এসে বানাও। কী বানাবে, কে বানাবে? এর উত্তর তিনি দেননি। দেখা যাচ্ছে বানানোর মানে অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধবিমান, সাবমেরিন, এইসবের বিদেশ থেকে আসা যন্ত্রাংশ জোড়ার কারখানা। ইতিমধ্যে রাফাল বিমানের এই রকম যন্ত্রাংশ জোড়ার কাজ রাষ্ট্রায়ত্ত এবং অভিজ্ঞ সংস্থা হ্যালের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে দেওয়া হয়েছে অনিল আম্বানির ভুইফোঁড় সংস্থাকে। ইতিমধ্যেই টাটা, আম্বানি, মিত্তাল, আদানি ইত্যাদি গোষ্ঠী নানা যুদ্ধাস্ত্র তৈরির বরাত নিয়ে মাঠে নেমেছে। প্রশ্নটা হল তাতে দেশের সাধরণ মানুষের কী লাভ? প্রথমত এই আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র তৈরি মানেই তার বাজার চাই। আর সেই বাজার তৈরি হতে পারে একমাত্র বিশ্ব জুড়ে যুদ্ধ-উত্তেজনা তৈরির মধ্য দিয়ে। যে কাজটি আমেরিকা, জাপান, জার্মানি, ফ্রান্স, ইজরায়েল, ইত্যাদি বনেদি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি করে চলেছে। সংকটগ্রস্ত বাজারের নতুন করে ভাগবাঁটোয়ারার জন্য তারা মরিয়া। সমাজতন্ত্র ত্যাগ করে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে নাম লেখানো চীন রাশিয়াও তাতে পিছিয়ে নেই। ভারতের একচেটিয়া মালিকদের জন্য বাজার দখলের স্বার্থে ভারত সরকারও দেশের মানুষের কল্যাণের নামে এই সাম্রাজ্যবাদীদের অন্যতম দোসর হিসাবে অস্ত্র ব্যবসার প্রসার চায়। এর ফলে কর্মসংস্থানের খোয়াব সরকার দেখাতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত অত্যাধুনিক শিল্পে এমনিতেই কর্মসংস্থান কম। তার ওপর এই উৎপাদন দেশের মানুষের প্রকৃত কোনও কাজে না এসে যে যুদ্ধ উন্মাদনা ডেকে আনে, তাতে মানুষের ক্ষতি হয় অনেক বেশি। মহান স্ট্যালিন এবং পরবর্তীকালে মহান নেতা শিবদাস ঘোষ আরও সুনির্দিষ্টভাবে দেখিয়ে গেছেন, সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদী বাজারের সামান্য একটুখানি আপাত স্থায়িত্বের জন্য আজকের বুর্জোয়া শাসকদের অর্থনীতির সামরিকীকরণ ছাড়া উপায় নেই। বাজারের সংকট মেটাতে গিয়ে পুঁজিবাদ কীভাবে উৎপাদনের সামগ্রিক ব্যবস্থাটাকে বারবার ধ্বংস করে ফেলে তা বিজ্ঞানের আলোকে দেখিয়েছে ১৮৪৮ সালে লেখা মার্কস-এঙ্গেলসের কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো। আজ সে সংকট এতটাই তীব্র যে এই বাজার নিয়ে কাড়াকাড়ি, অপরের বাজার ধ্বংস করতে গিয়ে গোটা উৎপাদনে নতুন বিশৃঙ্খলা আনা, এর থেকে এক মুহূর্তের জন্য বেরোতে পারছে না পুঁজিবাদী বাজারের কর্ণধাররা। জনসাধারণের প্রকৃত প্রয়োজন মেটানোর মতো উৎপাদন নিয়ে তাদের কোনও উৎসাহ আজ নেই। কারণ জনগণের কেনার ক্ষমতাই নেই। তাই জনগণের ট্যাক্সের টাকায় গড়া কোষাগার থেকে খরচ করে সামরিক খাতে ব্যয় বাড়িয়েই আজ কলকারখানা চালু রাখার পথ নিতে হচ্ছে। নরেন্দ্র মোদি এই কাজের এজেন্সি নিয়ে ‘আত্মনির্ভরতা’র ঢাক বাজিয়েছেন। ওই তথাকথিত আত্মনির্ভরতায় নির্ভর করলে সাধারণ মানুষের চরম বিপদ হবে। ভুলে গেলে চলবে না, এই করোনা মহামারির মধ্যে চীন-ভারতের যে সীমান্ত বিরোধ নিয়ে গলাবাজি চলছে তার সুযোগ নিয়েই ভারত সরকার মহামারি প্রতিরোধের কাজে অর্থাভাব না মিটিয়ে যুদ্ধাস্ত্রের পিছনে টাকা ঢালতে পারছে। ‘আত্মনির্ভর ভারত’ কি লড়াই-খ্যাপা অথচ যুদ্ধে পঙ্গু একটা দেশ হবে?

প্রধানমন্ত্রী স্বাধীনতা দিবসে রেকর্ড করে ফেলেছেন সবচেয়ে লম্বা ভাষণ দিয়ে। গলায় আবেগ ঢেলে তিনি যখন বলছেন, ‘কোনও দেশের বৈভব, উন্নতি প্রগতি নির্ভর করে তার কর্মশক্তির উপরে’— মনে হতে পারে এই বোধহয় তিনি দেশের অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করা ৯০ শতাংশের বেশি শ্রমিক, পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে কিছু বলে উঠবেন। কী করে এদের সৃষ্ট বৈভব গিয়ে আম্বানি-আদানিদের সিন্দুকে ঢুকে পড়ে, তার পর্দা ফাঁস করে দেবেন। কিন্তু কোথায় কী! অনেক কথার ফুলঝুরির আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের জীবনের আসল কথাগুলি।

প্রধানমন্ত্রী বলতে চাননি, কিন্তু আসল কথাগুলি বুঝে নিতে হবে দেশের খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষকেই। অগণিত শহিদের আত্মবলিদানের বিনিময়ে অর্জিত এ স্বাধীনতা আটকে পড়ল মুষ্টিমেয় ধনকুবেরের সিন্দুকে। এ তো নিয়তির বিধান নয়। দেশের মানুষের রক্তঝরানো এই অর্জনকে কুক্ষিগত করেছে দেশের পুঁজিপতি শ্রেণি। তাদের স্বার্থে পরিচালিত ভারত আজ তাই অপুষ্ট শিশুর সংখ্যায় দুর্ভিক্ষপীড়িত আফ্রিকার দেশগুলিকে ছুঁয়ে ফেলে প্রায়। নারীপাচারে শীর্ষ স্থানে পৌঁছে যায় ভারত। বেকারত্ব, অনাহার-অর্ধাহার আজ তার নিত্যসঙ্গী। খেটে খাওয়া মানুষের বদলে পুঁজিপতি শ্রেণির হাতে ক্ষমতা গেলে এমনটাই যে হবে তা ইতিহাস, বিজ্ঞান নির্ধারিত পথের সন্ধান করতে গিয়ে বুঝেছিলেন ভগৎ সিং, সুভাষচন্দ্র বসুর মতো মহান বিপ্লবীরা। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে স্বাধীনতার সৈনিকদের স্বপ্ন পূরণের জন্য কী করা দরকার তার পথনির্দেশ রেখে গেছেন বিশিষ্ট মার্কসবাদী দার্শনিক শিবদাস ঘোষ। এই পথে সমাজ বদলের সুনির্দিষ্ট ধারায় অগ্রসর হওয়াটাই আজ পথ। না হলে ভোটের বাক্সের খেলায় একটার পর একটা দল গদিতে আসবে, প্রধানমন্ত্রীর নাম, ঝাণ্ডার রঙ বদলাবে মানুষের দিন বদলাবে না। এমন করেই অসার কথার ফুলঝুরিতে ঢেকে যাবে মানুষের আর্তনাদ আর নতুন সমাজের জন্য শহিদদের আকুতি।

জীবনাবসান

কলকাতার অবিভক্ত টালিগঞ্জ আঞ্চলিক কমিটির পূর্বতন সম্পাদক, পার্টির প্রবীণ সদস্য কমরেড অধীর সরকার ৫ আগস্ট নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।

মেজভাই মিহির সরকার ছিলেন দলের কর্মী। সেই সূত্রে তাঁদের বাড়িতে দলের বৈঠক হত এবং সেখানেই তৎকালীন কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জীর সাথে কমরেড অধীর সরকারের পরিচয় ও মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসা। ধীরে ধীরে তিনি পার্টির সমর্থক থেকে কর্মীতে পরিণত হন। পরবর্তীকালে তিনি আঞ্চলিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। আইটিআই-এ ইন্সট্রাক্টর থাকাকালীন সহকর্মী ও ছাত্রদের তিনি দলের কথা বলতেন। সহজ, সরল মানুষ হিসেবে কর্মজীবনেও সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন কমরেড সরকার। বয়সজনিত অসুস্থতার কারণে সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে আঞ্চলিক কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন। বয়সে ছোট কমরেডদের নেতৃত্ব মেনে কাজ করতে তাঁর কোনও দিন অসুবিধা হয়নি। তাঁর ব্যবহার, চলাফেরা সবকিছুর মধ্যে ছিল দলের সংস্কৃতির ছাপ। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা পরিজন সকলকে পার্টির সঙ্গে যুক্ত রাখার চেষ্টা সর্বদা করে গেছেন তিনি। তাঁর বাড়ি ছিল দলের কর্মীদের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত।

বয়সজনিত বাধা উপেক্ষা করে, যতদিন চলাফেরা করতে পেরেছেন, একা রাস্তায় দাঁড়িয়ে গণদাবী বিক্রি করেছেন। আত্মীয়-স্বজন, চেনা-অচেনা যে কোনও মানুষের সাথে পার্টির কথাই বলতেন। একেবারে শেষের দিকে যখন আর বাইরে বেরোতে পারতেন না, দলের কোনও কর্মী দেখা করতে গেলে, বা যাকেই ফোন করতেন, পার্টির কাজের খোঁজ নিতেন, কমরেডদের সম্পর্কে জানতে চাইতেন। সদাহাস্যময়, সরল, অনাড়ম্বর কমরেড অধীর সরকার শেষজীবন পর্যন্ত পার্টিকে বুকে বহন করে গেছেন, জীবনের অনেক টানাপোড়েনের মাঝে পার্টিই ছিল তাঁর সব কিছু।

কমরেড অধীর সরকারের মৃত্যুতে এলাকার কর্মীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। রাতে মরদেহ কুঁদঘাটের বাসভবনে এলে, পার্টির কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রাজকুমার বসাক ও টালিগঞ্জ-২ আঞ্চলিক কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন চক্রবর্তী লাল সেলামের মধ্য দিয়ে কমরেড সরকারকে শেষবিদায় জানান। কমরেড অধীর সরকারের মৃত্যুতে দল সকলের প্রিয় পার্টি-অন্তঃপ্রাণ এক গুরুত্বপূর্ণ কমরেডকে হারাল।

কমরেড অধীর সরকার লাল সেলাম

এক বছর তো কেটে গেল
কেমন আছে কাশ্মীর ?

এই বছর ৫ আগস্ট দিনটা ঘরে অবরুদ্ধ হয়েই কাটল কাশ্মীরবাসীর। বিগত একটা বছর তাঁদের কেটেছে এভাবেই। অথচ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে এক বছর আগে তাঁদের বিশেষ সাংবিধানিক অধিকার ৩৭০ ধারা, রাজ্য হিসাবে স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার, রাজ্যের স্থায়ী অধিবাসীদের জমি-কাজের কিছু সুরক্ষা ব্যবস্থা কেড়ে নিয়ে বলেছিলেন, এর বিনিময়ে রাজ্যে উন্নয়ন আনবে কেন্দ্রীয় সরকার। আসবে শান্তি, প্রতিষ্ঠা হবে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, ব্যবস্থা হবে কর্মসংস্থানের।

এক বছর চলে গেছে, কাশ্মীরের মানুষের জীবনে শান্তি কি ফিরেছে? ঘরের উঠোনে কাঁটাতারের বেড়ার নিষেধাজ্ঞা, রাস্তায় বেরোলেই পদে পদে আপাদমস্তক চেকিং, আশঙ্কায় সিঁটিয়ে থাকতে থাকতে বাস্তবে বন্দি মানুষের জীবনে যেমন শান্তি থাকতে পারে সেটুকু শান্তি পেলেও কাশ্মীরবাসী হয়তো নিজেদের ধন্য মনে করতে পারতেন। কিন্তু সেটুকুও কি পেয়েছেন তাঁরা? আইনের শিক্ষক সওকত হোসেনের টুইটার পোস্টের ভাষায়— 'উন্নয়ন' যা চোখে পড়ছে, তা হল কাশ্মীরে হিংসা বৃদ্ধি, বাড়ছে সেনার বুটের শব্দ, অবরুদ্ধ রাস্তাঘাট।

সাংবাদিক নাজির মাসুদি মনে করেন, ৩৭০ ধারার পরিসর ছিল গোটা কাশ্মীরের জন্য। যে কারণে জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভায় পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জন্য ২৫টি আসন খালি রাখা ছিল। আজ ৩৭০ ধারাটিই না থাকায় কাশ্মীরকে মেনে নিতে হবে, পাকিস্তানের দখলে থাকা ওই অংশটির উপর তার আর অধিকার নেই। যা কাশ্মীরীয়তের ধারণার উপর এক নতুন আঘাত। কাশ্মীরের যে নেতারা সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন, তাঁরাই দীর্ঘদিন বন্দি থাকার পর কয়েকজন মুক্তি পেলেও বাকিরা এখনও বিনা বিচারে বন্দি। সব কিছু স্বাভাবিক দেখানোর বাসনায় বেশিরভাগ দলের নেতাকে আটক করে রেখে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন জম্মু-কাশ্মীর প্রশাসন সরপঞ্চ (পঞ্চায়েত) নির্বাচনের প্রহসন করেছিল। তাতে বিজেপি সব আসনে 'নিরঙ্কুশ' জয় পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই দেখা গেল নির্বাচিত সরপঞ্চদের সাথে স্থানীয় গ্রামের মানুষের কোনও যোগাযোগ নেই। এর বিষময় ফল ভুগতে হচ্ছে সেই সরপঞ্চদেরই। তারা যখন সন্ত্রাসবাদীদের টার্গেট হয়ে উঠছেন

> বাস্তবে জম্মু-কাশ্মীর প্রশাসন নামে কেন্দ্রীয় সরকারের যে শাসন কাশ্মীরে চলছে তার সাথে সাধারণ মানুষের যোগসূত্র বলে কিছু নেই বললেই চলে। প্রশাসন ব্যস্ত সবকিছু স্বাভাবিক দেখাতে।

গ্রামের মানুষ তাঁদের পাশে থাকছে না। এর ফলে একের পর এক সরপঞ্চকে সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে প্রাণ দিতে হচ্ছে। অথচ আগে তাঁরা ছিলেন গ্রামের মানুষের দ্বারা সুরক্ষিত। কাশ্মীরের সংসদীয় রাজনীতির মূলধারায় থাকা বিজেপি ছাড়া সব দলের নেতাকে গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে দীর্ঘদিন আটক রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তাঁদের মধ্যে তিনজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, বর্তমান সাংসদ আছেন। এই রাজনৈতিক শূন্যতার জায়গা নিচ্ছে সন্ত্রাসবাদ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ। কেন্দ্রীয় সরকার তা দেখেও দেখছে না কেন? এই সন্ত্রাসবাদকে জিইয়ে রাখতে পারলে বিজেপির সর্বভারতীয় ভোট ব্যাঙ্কে সুবিধা হবে বলে কি! ২০২০-র প্রথমার্ধেই কাশ্মীরে ২২৯ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে সন্ত্রাসবাদী হামলা বা সামরিক বাহিনীর গুলিতে।

বাস্তবে জম্মু-কাশ্মীর প্রশাসন নামে কেন্দ্রীয় সরকারের যে শাসন কাশ্মীরে চলছে তার সাথে সাধারণ মানুষের যোগসূত্র বলে কিছু নেই বললেই চলে। প্রশাসন ব্যস্ত সবকিছু স্বাভাবিক দেখাতে। তারা গত বছর আগস্টেই ঘোষণা করে দিয়েছিল, সব স্কুল-কলেজ খুলে গেছে। অথচ বাস্তব হল এক বছর পরেও বেশিরভাগ শিশু-কিশোর স্কুলেই যায় না। কলেজেও ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠাতে অভিভাবকরা ভয় পান। রাস্তায় মিলিটারির হাতে কী নির্যাতন অপেক্ষা করে আছে কেউ জানে না। বস্তুত বিজেপি এবং অতীতে কংগ্রেস নিজেদের উচ্চবর্ণের হিন্দু ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে, কাশ্মীরী মানেই সন্ত্রাসবাদী, বিচ্ছিন্নতাবাদী— এমন একটা ধারণা দেশে যেভাবে তৈরি করেছে তার প্রভাব সামরিক-আধা সামরিক বাহিনীর সদস্যদের উপর ব্যাপক মাত্রায় কাজ করে। কিশোর-যুবকদের সেখানে সর্বদাই সন্দেহের চোখে দেখে প্রশাসন এবং সশস্ত্র বাহিনী। বর্তমানে কাশ্মীরে কর্মরত কেন্দ্রীয় অফিসারদের মধ্যে মাত্র একজন কাশ্মীরী, বাকি সকলকেই কেন্দ্র পাঠিয়েছে বাইরে থেকে, বিজেপির অ্যাজেন্ডা পূরণের বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে। ফলে তাদের সাথে এলাকার মানুষের মানসিক বিচ্ছিন্নতা অতল খাদের মতো। ফলে প্রশাসন বাস্তবে যা ঘোষণা করে, বলে, তার সাথে গ্রাউন্ড রিয়েলিটি অর্থাৎ প্রকৃত বাস্তবের কোনও সম্পর্ক নেই। ফলে কিছু কিছু পড়াশোনা ব্যক্তিগত উদ্যোগে চললেও তা প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। এর উপর দীর্ঘদিন ইন্টারনেট বন্ধ থাকার পর অতি পুরনো টুজি মানের ইন্টারনেট চালু হলেও তার সাহায্যে পড়াশোনা করা, সর্বভারতীয় পরীক্ষার ফর্ম ফিলআপ, গবেষণা, করোনা আবহে অনলাইন ক্লাস

চারের পাতায় দেখুন

রক্তে রাঙা ১৯ আগস্ট ১৯৮৩

একের পাতার পর

সামিল হলেন হাজারে হাজারে নিরস্ত্র নারী পুরুষ।

একদিকে জনতার দাবি নিয়ে দাঁড়াল সংগ্রামী বামপন্থা, বিপরীতে মালিক তোষণের অ-বাম নীতির পক্ষে দাঁড়াল গণআন্দোলনের বিরোধী 'বামপন্থী' তকমাধারী সরকারি দল। রচিত হল গণআন্দোলন দমনের এক কালো অধ্যায়।

ওই দিন সকাল ন'টা নাগাদ রাজ্য সরকারের 'স্বেচ্ছাসেবক' (পড়ুন ঠ্যাঙাড়ে) বাহিনী লাঠি- রড-হকিস্টিক নিয়ে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের ওপরে। একই সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ে আগের রাত্রিতে পুরুলিয়া ব্যারাক থেকে মোতায়েন করে রাখা বিশাল পুলিশবাহিনী। শুরু হয় বর্বর লাঠিচার্জ। প্রতিরোধী জনতাকে কোনওভাবেই পিছু হটাতে না পারায় তৎকালীন রাজ্য সরকারের তল্পিবাহক রেসিডেন্সিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জয়ন্ত মিত্র আকস্মিকভাবে টিয়ার গ্যাস ও গুলিচালনার নির্দেশ দেন। বিশাল পুলিশবাহিনী মুটে, রিকশাচালক, পরিচারিকা— হতদরিদ্র, ন্যুব্জ সাধারণ মার-খাওয়া জনগণের এই উজ্জ্বল সংগ্রামী রূপ দেখে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। সারা রঘুনাথপুর জুড়ে তাণ্ডব চালায় পুলিশ বাহিনী, দোকান-বাজার-বাসস্থান লক্ষ্য করে, আন্দোলনের পক্ষে থাকা শহরবাসী ও আন্দোলনকারীদের আতঙ্কিত করে তোলার জন্য গুলি চালাতে থাকে। শহরের পাইসাপাড়ায় অবস্থিত তৎকালীন এসইউসিআই(সি) অফিস বাড়িটিতে গুলি চালায় পুলিশ, যে গুলির দাগ আজও সেই বাড়িটি বহন করছে। পাড়ায় পাড়ায় ঢুকে পুলিশ তাণ্ডব চালায়। রঘুনাথপুর শহরের ধোবাপাড়ার গরিব শ্রমিক পরিবারের সন্তান হাবুল রজক এবং তাঁতিপাড়ার দোকান কর্মচারী শোভারাম মোদককে গুলি চালিয়ে হত্যা করে। শহরের বিশিষ্ট নাগরিক মানিক নন্দী মৃতদেহ তুলতে গেলে পুলিশ গুলি চালিয়ে তাঁর পা নষ্ট করে দেয়। জিতেন ঘোষাল নামে আরও এক যুবক গুলিবিদ্ধ হন।

ক্রোধে উন্মত্ত এই পুলিশি তাণ্ডবের মধ্যে শহরের জনগণ রাস্তায় নেমে আসেন। প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে রঘুনাথপুর শহর। পুলিশ ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করে। আন্দোলনকারী থেকে সাধারণ শহরবাসী— পুলিশি ধরপাকড় থেকে কেউ বাদ যায় না।

পুরুলিয়ায় শহিদ দিবস পালন

১৯ আগস্ট দলের পুরুলিয়া জেলা কমিটির আহ্বানে রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া শহর, পাড়া, আড়ষা, কাশিপুর, হুড়া সহ প্রতিটি ব্লকে বাসভাড়া বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনের 'শহিদ দিবস' পালন করা হয়। রঘুনাথপুর শহরে শহিদ বেদির সামনে এ দিন স্মরণ অনুষ্ঠান পালিত হয় (ছবি প্রথম পাতায়)। বহু মানুষ সমবেত হয়ে দুই শহিদকে শ্রদ্ধা জানান। এই কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন দলের পুরুলিয়া জেলা কমিটির সদস্য এম কে সিনহা এবং বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির অন্যতম দুই সদস্য লক্ষীনারায়ণ সিনহা ও বিনয় ভট্টাচার্য।

এরপর শুরু হয় আন্দোলনের আর এক গৌরবময় অধ্যায়। ঘটনার পরের দিনই পালিত হয় জনতার স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট। পুলিশী নৃশংসতার প্রতিবাদে রঘুনাথপুর বার অ্যাসোসিয়েশন কোর্ট বয়কট করে। রঘুনাথপুর পৌরসভা লাগাতার বয়কট আন্দোলনের ডাক দেয়। শহরের সাধারণ মানুষ লাগাতার অসহযোগ আন্দোলনে সামিল হন। শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে এই বর্বরতার প্রতিবাদে পুলিশকে সামাজিকভাবে বয়কট করে শহরবাসী। এই নৃশংসতার দুঃস্বপ্ন এবং সংগ্রামের গৌরবময় স্মৃতি আজও বহন করছে পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুর।

শহিদ হাবুল ও শোভারামের নেতা গরিব মেহনতি মানুষের মহান মার্কসবাদী শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষের সুযোগ্য ছাত্র বিপ্লবী শিল্পী শীতেশ দাশগুপ্তের শিল্পরচনা শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ শহরের প্রধান সড়কের পাশে আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে সংগ্রামী বামপন্থার উজ্জ্বল প্রতীক হয়ে।

আজও ১৯ আগস্ট আসে। শোক সন্তাপ নিয়ে বর্ষার কালো মেঘ শহিদের স্মৃতিস্তম্ভে ঝরে পড়ে। আজও সকালে একদল আলোকসন্ধানী মানুষ গভীর শ্রদ্ধায় শহিদদের স্মরণ করে সমবেত হন স্মৃতিস্তম্ভের সামনে। আজও শহিদ স্মরণের সকালে কেউ পরম আবেগে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে গেয়ে ওঠেন—

'...কচি হাবুল রজক ছিল রঘুনাথপুরে
মেকি বামের নখরে গেল অকালে ঝরে,
বাস গেলে বাস ফিরে আসবে,
বাছা হাবুল কি আর ফিরে আসবে ?
ডুকরে ডুকরে কাঁদে হাবুলের মা
বুকের মানিক বুঝি ফিরে এল না।
বাছা ফিরে এল না...'

আজও শহিদ স্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে বৃহত্তর সংগ্রামের আকাঙ্খায় কোনও যুবক স্লোগান তোলে— 'সংগ্রামী বামপন্থা জিন্দাবাদ', 'অমর শহিদ হাবুল রজক-শোভারাম মোদক লাল সেলাম', '১৯ শে আগস্ট লাল সেলাম'। আজও রক্তপতাকা, চেতনাদীপ্ত আপসহীন সংগ্রামের গভীর প্রত্যাশায় আন্দোলিত হয়। আজও রক্তস্নাত সংগ্রামধৌত শহিদ দিবস ডাক দিয়ে বলে যায়— '...তাকে তোমরা বাঁচিয়ে রেখো।

কার কথা বলছি তোমরা নিশ্চয়ই জানো,
সে রকম একজন হয়ত তোমাদের গ্রামেও আছে,
যে নিজের বাঁচার কথা চিন্তা করতে জানে না,
সকলের বাঁচার ভাবনা তার।
আমার বিদ্যুৎ-আলোকিত শহরে মাঝে মাঝে সে হারিয়ে যায়,
অথচ বিষাদের রাত্রিতে তাকে খুঁজে পাই আকাশের তারার মতো।
তাকে তোমরা বাঁচিয়ে রেখ।' *(কবিতা ঋণ ঃ গোলাম কুদ্দুস)*

উত্তরাখণ্ডে ছাত্রবৃত্তির কোটি কোটি টাকা লোপাটে জড়িত বিজেপির প্রভাবশালীরা

বিজেপির নেতাদের দাবি— তাঁরা 'রামরাজ্য' গড়বেন। সেই রামরাজ্যের রাজা-উজিররা কেমন মহান চরিত্রের মানুষ হবেন, তার নমুনা সম্প্রতি দেখা গেল উত্তরাখণ্ডের এক ন্যক্কারজনক ঘটনায়।

সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ, উত্তরাখণ্ডে দেড়শোরও বেশি বেসরকারি ও সরকার-পোষিত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ তফসিলি ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তির নামে বরাদ্দ কোটি কোটি টাকা লোপাট করে দিয়েছে। হাইকোর্টের নির্দেশে গঠিত বিশেষ তদন্তকারী সংস্থার রিপোর্ট উল্লেখ করে সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ২০১১ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত এই খাতে রাজ্য সরকারের বরাদ্দ ৭২০০ কোটি টাকার বড় অংশই জালিয়াতি করে হাপিশ করে দেওয়া হয়েছে এবং এই দিনে-ডাকাতির সঙ্গে শুধু কলেজ কর্তৃপক্ষ বা ব্যাঙ্ক কর্তারাই নন, যুক্ত রয়েছেন বিজেপিশাসিত এই রাজ্যের বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী নেতা।

কীভাবে চলত এই আত্মসাৎ যজ্ঞ? কলেজ কর্তৃপক্ষ তফসিলি ছাত্র হিসেবে ভুয়ো নাম নথিভুক্ত করে তাদের নামে ভুয়া ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলত। তারপর সেই অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে যেত সরকারি কোষাগার থেকে দেওয়া টিউশন ফি-র একটা বিরাট অংশ। এই ভুয়ো ছাত্রদের কেউ ঠিকা মজদুর, কেউ বা রিকশাচালক। অনেকেই অপ্রাপ্তবয়স্ক। তাদের আধার কার্ড, ভোটার কার্ড হাতিয়ে নিয়ে যারা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলেছে, বুঝতে অসুবিধা হয় না, তারা অবশ্যই যথেষ্ট প্রভাবশালী এবং শাসক দলের কেষ্টবিষ্টু। জালিয়াতির মাথা হিসেবে যাদের চিহ্নিত করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বেশ কয়েকজন বিজেপি নেতা ও তাদের পরিজনরা। দেরাদুনের ৫৭টি কলেজ ও অন্য ১১টি জেলার ৫৩টি কলেজের মালিক ও কর্মচারী সহ একশোরও বেশি লোকের নাম এফআইআর-এ রয়েছে, যাঁদের মধ্যে আছেন বিজেপি শাসিত এই রাজ্যের বেশ কিছু প্রভাবশালী রাজনীতিক। বিধানসভার প্রাক্তন এক স্পিকারের কলেজেও জালিয়াতির প্রমাণ মিলেছে। অভিযোগ উঠছে বিজেপির এক বিধায়কের ছেলের বিরুদ্ধেও (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪ আগস্ট, ২০২০)। এ হেন বিজেপির স্বপ্নের রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে, দুর্নীতির কাদায় মাখামাখি তার চেহারাটা কেমন হবে, এ ঘটনা থেকেই তা পরিষ্কার। বিজেপি নেতারা বলছেন, ক্ষমতায় এলে তাঁরা নাকি 'সোনার বাংলা' গড়ে দেবেন! সোনার গুজরাট গড়া হয়েছে। সোনার উত্তরাখণ্ডের চেহারাও চোখের সামনে প্রকট। ফলে এসব থেকে সেই 'সোনার বাংলা' কেমন হতে পারে তার স্পষ্ট পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে।

এই দুর্নীতি আর একটা 'মিথ'ও ভেঙে দিল। অনেকেরই ধারণা, সরাসরি উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে সরকারি টাকা এলে দুর্নীতির সম্ভাবনা কমে। তাদের দুগ্ধপোষ্য প্রমাণ করে উত্তরাখণ্ডের বিজেপি শাসন দেখিয়ে দিল, দুর্নীতির নতুন নতুন পথ উদ্ভাবন করতে অসাধু দুর্নীতিবাজদের অসুবিধা হয় না।

শূন্যপদ ২ হাজার আবেদনকারী ২০ লক্ষ

কর্মসংস্থানের ভয়াবহ চিত্র আবারও সামনে এল রাজ্যের বনবিভাগে কর্মী নিয়োগকে কেন্দ্র করে। সম্প্রতি বন-সহায়ক পদে ২০১৩টি শূন্য পদের জন্য জমা পড়েছে ২০ লক্ষ আবেদনপত্র! হাতি তাড়ানো, বন পাহারা দেওয়া, চারাগাছ লাগানো ও পরিচর্যা করা ইত্যাদি যে কাজগুলির জন্য ধার্য যোগ্যতামান অষ্টম শ্রেণী পাস, সেখানে দেখা যাচ্ছে আবেদনকারীদের মধ্যে রয়েছেন এমএ, এমএসসি, পিএইচডি ডিগ্রিপ্রাপ্ত উচ্চশিক্ষিতরাও।

মাত্র ১০ হাজার টাকা বেতনের চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী এই পদের জন্য এই বিপুল সংখ্যক আবেদনের ঘটনা থেকে কি রাজ্যের বেকারত্বের ভয়ানক চেহারাটি স্পষ্ট হয়ে যায় না? এ চিত্র শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয়, সারা দেশের। কয়েক বছর আগে উত্তরপ্রদেশে ৩০০টির মতো পিয়ন পদের জন্য আবেদন করেছিলেন প্রায় ২৫ লক্ষের মতো কর্মপ্রার্থী, যাদের মধ্যে এমএ, এমএসসি, পিএইচডি ডিগ্রিধারীরা ছাড়াও ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করা দক্ষ বেকাররাও ছিলেন। অন্যান্য রাজ্যেও এমন অভিজ্ঞতা অসংখ্য।

বেকার সমস্যা গোটা ভারতেই ভয়াবহ আকার নিয়েছে। এ কোনও বিশেষ সরকারের ব্যর্থতা, তা নয়। বরং বলা যায়, ক্ষমতায় আসীন একের পর এক সরকারের চাকরি প্রদানে পুঞ্জীভূত ব্যর্থতা বেকার সমস্যাকে আজ এমন বারুদের স্তূপের উপর দাঁড় করিয়েছে।

কেন সব সরকারই বেকার সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ? বর্তমান শাসকবর্গ বলতেই পারেন, করোনা অতিমারির সঙ্কট সমস্ত ক্ষেত্রে উৎপাদনকে স্তব্ধ করে দেওয়ায় কর্মহীনতার যে বাড়তি সমস্যার জন্ম হয়েছে তার ফলেই চাকরির পরীক্ষায় এত আবেদনকারী। কিন্তু আবেদনের এই প্রাবল্য প্রাক-করোনা পরিস্থিতিতেও কম ছিল না। তা হলে এই সংকটের শিকড় কোথায়? সমাধানই বা কি?

কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি বলছে তারা রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। কখনও বলছে, সোনার বাংলা গড়বে। কিন্তু তাদের 'রামরাজত্বে' এই ভয়াবহ বেকার সমস্যার সমাধান কোন পথে হবে, বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা এ বিষয়ে একটি কথাও পরিষ্কার করে বলছেন না। বস্তুত ফাঁপা কিছু স্লোগান ছাড়া বেকার সমস্যা দূর করার কোনও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচিই বিজেপির বা কেন্দ্রীয় সরকারের নেই। বরং তাদের বেসরকারিকরণ, বিলগ্নীকরণের নীতি, জনবিরোধী শ্রমসংস্কার আইন, পদবিলোপ নীতি কর্মসংস্থানের সমস্যাকে আরও ভয়ঙ্কর করে তুলছে। এর ওপর করোনা অতিমারিকে অজুহাত করে যেভাবে অনলাইন কার্যকলাপের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে তাতে আগামী দিনে কর্মসংস্থানের দরজা আরও বেশি করে বন্ধ হয়ে যাবে। রুজি-রোজগারের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে থাকা অসংখ্য কর্মপ্রার্থীর কাছে এ চিত্র অত্যন্ত বেদনার ও আশঙ্কার। এই অবস্থায় কাজের সংস্থান করা দূরের কথা, উল্টে কি সরকারি, কি বেসরকারি— সমস্ত ক্ষেত্রেই সবচেয়ে কম সংখ্যক কর্মী দিয়ে সবচেয়ে বেশি কাজ করিয়ে নেওয়ার নীতিই অনুসৃত হচ্ছে। এর মূলে রয়েছে খরচ কমিয়ে সর্বোচ্চ মুনাফা লোটার লক্ষ্য। এটাই হল পুঁজিবাদী উৎপাদনের মূল লক্ষ্য। সর্বোচ্চ মুনাফা লুটের এই পুঁজিবাদী লালসায় মালিকদের কাছে দেশের বেকার জনগণের, এমনকি গোটা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির ভালো-মন্দ বিচারের কোনও স্থান নেই। এ দেশের পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে গিয়ে স্বাধীনতার পর থেকে একের পর এক সরকার বেকার সমস্যাকে এই ভয়ানক পরিস্থিতিতে দাঁড় করিয়েছে। মাত্র ২০১৩টি বন-সহায়ক পদের জন্য ২০ লাখ কর্মপ্রার্থীর আবেদন সেই পরিস্থিতির একটি সূচক মাত্র।

একটি আঞ্চলিক পুঁজিবাদী দল হিসেবে রাজ্যে ক্ষমতাসীন তৃণমূল সরকার কিংবা কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যে নীতি নিয়ে চলছে তাতে চাইলে কেবল কিছু বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে মাত্র— গোটা দেশের এই ভয়াবহ সমস্যা দূর করার ক্ষমতা তাদের নেই। বেকার সমস্যার মূল কারণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখে দেশের সকল কর্মপ্রার্থীর জন্য কাজের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। তার জন্য চাই পরিকল্পিত অর্থনীতি, যা সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ভিত্তি। এই সত্য এ দেশের বিপুল বেকারবাহিনী যত তাড়াতাড়ি বুঝবেন ততই মঙ্গল।

কেমন আছে কাশ্মীর?

তিনের পাতার পর

কিছুই সম্ভব নয়। ফলে কাশ্মীরের ছাত্রছাত্রীরা ক্রমাগত বিচ্ছিন্নতার বোধেই ডুবে যাচ্ছে।

কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের বিনিময়ে ৪০ হাজার নতুন চাকরির কথা এক বছর আগে ঘোষণা করেছিল প্রশাসন। বাস্তবে সেখানে বেকারি আকাশ ছুঁয়েছে। ফল বাগিচা, কার্পেট, শাল তৈরি, পর্যটন ইত্যাদি ক্ষেত্র এক বছর পুরো স্তব্ধ। কাশ্মীর চেম্বার্স অফ কমার্সের হিসাবে কমপক্ষে ৪ লক্ষ মানুষ জীবিকা হারিয়েছেন করোনার আগেই। তারপর সে সংখ্যা আরও বেড়েছে। অন্তত ৪৭ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা হারিয়েছেন কাশ্মীরের ছোট-মাঝারি ব্যবসায়ীরা। দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনের ঢাক পেটানোটাও একেবারে শূন্যগর্ভ। তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত সক্রিয় কর্মী (অ্যাক্টিভিস্ট) রাজা মুজাফফর ভাট দেখাচ্ছেন, জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা, অন্ত্যোদয়, বিপিএল ইত্যাদির মাধ্যমে রেশনে খাদ্য সামগ্রীর প্রাপ্য থেকে কাশ্মীরের লক্ষ লক্ষ মানুষ বঞ্চিত। কারণ অসাধু অফিসার এবং রেশন ডিলাররা এই সমস্ত গ্রাহকের অন্ত্যোদয়, বিপিএল ইত্যাদি কার্ড চেপে রেখে তাদের জাল এপিএল কার্ড দিয়েছে। আগে অন্তত অফিসারদের মাথার উপর থাকা জনপ্রতিনিধিদের ভোটের ভয় ছিল, এখন কোনও জবাবদিহির দায় নেই। ফলে তারা বেপরোয়া। অন্য সমস্ত ক্ষেত্রেও চলছে সীমাহীন দুর্নীতি। সম্প্রতি জম্মু-কাশ্মীর প্রশাসন পরিবেশ রক্ষার অজুহাতে ডাল এবং নিগিন লেকে শিকারা ও হাউস বোটের উপর এমন করে নানা নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছে যাতে বৃহৎ করপোরেট ছাড়া অন্য সকলে সেখান থেকে ব্যবসা গোটাতে বাধ্য হয়। অথচ এই প্রশাসনই ১০টি জেলাতে কয়েক কোটি রুশ পপলার গাছ কেটে কয়েদিনের মধ্যে পাচার হতে দিয়েছে। এই গাছ থেকে করোনা ছড়ায় এই গুজব তুলতেও সাহায্য করেছে তারাই।

সাংবাদিক এবং সংবাদমাধ্যমের উপর চলছে বর্বর আক্রমণ। সম্প্রতি প্রশাসন সংবাদমাধ্যমের জন্য যে নির্দেশিকা জারি করেছে তাতে বলা হয়েছে বাস্তবে সরকারের যে কোনও সমালোচনাকেই রাষ্ট্র বিরোধিতা হিসাবে দেখা হবে। জম্মু কাশ্মীর সাইবার পুলিশ হুমকি দিয়ে বলেছে, সাবধানে খবর করুন, আমরা সব দেখছি। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্র সাংবাদিক মাসরাত জাহারা এবং গওহর গিলানির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী ইউএপিএ আইনে মামলা করা হয়েছে। একটি খবরের জন্য থানায় ডেকে ধমকানো হয়েছে পিরজাদা আশিককে। দু বছরের জেল খাটছেন সাংবাদিক অসিফ সুলতান। কাশ্মীরের প্রখ্যাত সাংবাদিক সুজাত বুখারিকে গুলি করে কারা হত্যা করল সেটা রহস্যই থেকে গেছে।

বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার বলেছিল কাশ্মীরকে তারা সারা দেশের সাথে মিলিয়ে দিতে ৩৭০ ধারা বাতিল করছে। এতেই কাশ্মীরে শান্তি আসবে। সেদিন এস ইউ সি আই (সি) বলেছিল এই পদক্ষেপ বিচ্ছিন্নতার শক্তিকেই সাহায্য করবে। কাশ্মীরী জনগণের মর্যাদায় আঘাত লাগবে। যার ফলে যে কাশ্মীরী জনগণ ভারতের সাথে থাকার পক্ষেই একদিন লড়েছে তাদের আহত মানসিকতার সুযোগ নেবে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি। আজকের পরিস্থিতি দেখিয়ে দিচ্ছে সে বিশ্লেষণ কত সঠিক ছিল। যত দমন পীড়নের রাস্তায় যাচ্ছে সরকার, তত পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে।

আজ দরকার কাশ্মীরের জনগণের গণতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক, ন্যায্য দাবির পাশে দাঁড়িয়ে দেশ জুড়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলা। কাশ্মীরের ন্যায্য দাবির পাশে সারা দেশের বামগণতান্ত্রিক বোধসম্পন্ন মানুষ যদি দাঁড়াতে পারে, তাহলেই একমাত্র কাশ্মীরের জনগণকে আশ্বস্ত করে বিচ্ছিন্নতা এবং সন্ত্রাসের শক্তিকে পরাস্ত করা সম্ভব। নিছক ভোট রাজনীতির চমকে যা হওয়ার নয়।

(সূত্র ঃ দ্য ওয়্যার ১১ জুলাই ২০২০। এনডি টিভি ৪ আগস্ট ২০২০।

আনন্দবাজার পত্রিকা ৬ আগস্ট ২০২০)

ঐতিহাসিক ছাত্রশহিদ দিবসকে ‘পুলিশ দিবস’ ঘোষণা

তীব্র প্রতিবাদ এআইডিএসও-র

১ সেপ্টেম্বর ছাত্র শহিদ দিবসকে পুলিশ দিবস হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণাকে ধিক্কার জানিয়ে এআইডিএসও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক মণিশঙ্কর পট্টনায়ক ১৮ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন, এই সিদ্ধান্ত শুধু সরকারের অগণতান্ত্রিক মনোভাব নয়, চূড়ান্ত স্বৈরাচারী চরিত্রকেও সামনে আনল। মানুষ জানেন, ১৯৫৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর খাদ্য আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে আয়োজিত ছাত্রদের মৌনমিছিলে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়ের কংগ্রেস সরকারের পুলিশ নির্মম গুলি চালিয়ে ৮ জন ছাত্রকে হত্যা করে। এই ঘৃণ্য ঘটনার পর থেকে ওই দিনটি প্রতিবছরই ঐতিহাসিক ছাত্রশহিদ দিবস হিসেবে পালন করে চলেছে এ রাজ্যের গণতন্ত্রপ্রিয় ছাত্রসমাজ। পশ্চিমবঙ্গের গণআন্দোলনের ইতিহাসে এই ঘটনা একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে মানুষ মনে রেখেছে। মানুষ দেখেছে পুলিশ-প্রশাসন বরাবরই শাসক দলের পক্ষে দাঁড়িয়ে জনসাধারণের ন্যায়সঙ্গত গণআন্দোলন দমনে ন্যক্কারজনক ভূমিকা পালন করে থাকে। পুলিশের লাঠি-গুলিতে অসংখ্যবার রক্তাক্ত হয়েছে এ দেশের রাজপথ। এতদসত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে পুলিশের ভূমিকাকে প্রশংসা করে ১ সেপ্টেম্বর দিনটিকেই ‘পুলিশ দিবস’ হিসেবে পালনের ঘোষণা করলেন তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এতে পুলিশের সেই কলঙ্কিত নৃশংসতাকেই বর্তমান তৃণমূল সরকার প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দিল। আমরা এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করছি এবং সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি, ১ সেপ্টেম্বর এই ঘোষণা অবিলম্বে বাতিল করা হোক। পাশাপাশি আমরা ছাত্রসমাজের কাছে ওই দিনটি যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে ঐতিহাসিক ছাত্রশহিদ দিবস পালনের মাধ্যমে এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানাচ্ছি।

৩১ আগস্ট সম্পূর্ণ লকডাউন ও ১ সেপ্টেম্বর ‘পুলিশ দিবস’ ঘোষণার প্রতিবাদ

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১৮ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেছেন,

৩১ আগস্ট সম্পূর্ণ লকডাউন এবং ১ সেপ্টেম্বর ‘পুলিশ দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী তার জনস্বার্থ বিরোধী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৫৯ সালের ৩১ আগস্ট খাদ্য-আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে সরকারি মতেই ৮০ জন মানুষ নিহত হন এবং মূল্যবৃদ্ধি-ভাড়াবৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনে ’৯০ সালের ৩১ আগস্ট পুলিশের গুলিতে শহিদ হন মাধাই হালদার। প্রতি বছর অগণিত মানুষ এই দিনটিতে সমবেত হয়ে তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অথচ ৩১ আগস্ট মুখ্যমন্ত্রী শুধু লকডাউন ঘোষণা করলেন তাই নয়, ’৫৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর যে পুলিশ ছাত্রদের বুক লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে ৮ জন ছাত্রকে হত্যা করে বর্বরতার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছে সেই ১ সেপ্টেম্বরকে ‘পুলিশ দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করলেন। এ ছাড়াও সাধারণ মানুষের উপর পুলিশের নৃশংস অত্যাচারের কতশত ইতিহাস রয়েছে এই বাংলায়।

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিশ্চিত ভাবেই তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি যে, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে এবং রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে পুলিশী বর্বরতার বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ।

আমরা খাদ্য আন্দোলনের শহিদদের শ্রদ্ধা জানানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ৩১ আগস্টের লকডাউন ও ১ সেপ্টেম্বর পুলিশ দিবস ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি করছি।

দুষ্কৃতী তালিকায় শহিদ ক্ষুদিরামের ছবি

ডিএসও-র আন্দোলনের চাপে নতিস্বীকার জি-৫ কর্তৃপক্ষের

জি-৫ অরিজিন্যাল ওয়েব প্লাটফর্মে ‘অভয় ২’ নামের একটি ওয়েব সিরিজের এক দৃশ্যে দেখা গেল পুলিশ চৌকির নোটিশ বোর্ডে দুষ্কৃতীদের ছবির সঙ্গে দেওয়া হয়েছে শহিদ ক্ষুদিরামের ছবি। ঘটনা নজরে আসতেই প্রতিবাদ জানায় এআইডিএসও। ১৭ আগস্ট রাজ্যজুড়ে জেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। সর্বত্রই এই ন্যক্কারজনক ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বিক্ষোভে সামিল হন সাধারণ মানুষ। জলপাইগুড়িতে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের হেনস্থা করে। গ্রেপ্তার হন ৮ জন। পশ্চিম মেদিনীপুরে ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে এবং কলকাতার পার্ক স্ট্রিট মোড়ে বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক এবং রাজ্য সভাপতি। তাঁরা বলেন, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর বিপ্লবী কিশোর শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসির মঞ্চে আত্মবলিদান, তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ, সুতীব্র দেশপ্রেম এ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে একটা নতুন বিপ্লবী ধারার সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। সমগ্র

মেদিনীপুর শহর

পার্ক স্ট্রিট

দেশকে নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল শহিদ ক্ষুদিরামের জীবনসংগ্রাম। সেই সময় ব্রিটিশ সরকার চেয়েছিল ক্ষুদিরামকে সন্ত্রাসবাদী আখ্যায়িত করে তাঁর মহান চরিত্রকে কালিমালিপ্ত করতে। স্বাধীনতার পরেও বারবার সেই অপচেষ্টা চলেছে। জি-৫ ওয়েব প্লাটফর্মেও সেই অপচেষ্টার পুনরাবৃত্তি দেখা গেল। এই ঘটনার তীব্র ধিক্কার জানান তাঁরা।

এআইডিএসও-র পক্ষ থেকেই সর্বপ্রথম জি-৫ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবাদপত্র পাঠিয়ে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া ও দোষীদের শাস্তির দাবি জানানো হয়। রাজ্য জুড়ে তীব্র আন্দোলনের চাপে কর্তৃপক্ষ ভুল স্বীকার করেন ও ছবিটি সরিয়ে নেন। সংগঠন দাবি করেছে, শুধু ভুল স্বীকার নয়, ওয়েব সিরিজের ওই অংশ অবিলম্বে বাদ দিতে হবে ও প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে এবং প্রশাসনকে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। ক্ষুদিরাম বসু সহ স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার বিপ্লবীদের সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়কে কালিমালিপ্ত করার অপচেষ্টা শাসকের পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন ধরেই চলছে। এর বিরুদ্ধে সর্বস্তরের সাধারণ মানুষকে প্রতিবাদে সামিল হওয়ার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে আবেদন জানানো হয়।

বালুরঘাট

কোচবিহার

জলপাইগুড়ি

পাঠকের মতামত

শহিদদের সংগ্রাম ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে

আজ যখন দেখি গোটা সমাজ জুড়ে মানুষকে অমানুষ করার একটা আয়োজন চলছে, তখন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর যোদ্ধাদের কথা বারবার মনে পড়ে।

ক্ষুদিরামের ফাঁসির পরের দিন 'দি এম্পায়ার' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, 'Kshudiram Bose was executed this morning.....It is alleged that he mounted the scaffold with his body erect. He was cheerful and smiling.' এত আনন্দ তাঁর কীসের জন্য? তিনি নিশ্চিত ছিলেন, তাঁর এই আত্মত্যাগ বিফলে যাবে না। আমরা, তাঁর উত্তরসূরীরা স্বাধীন দেশে আনন্দে দিন কাটাব।

সেদিন ক্ষুদিরামের আত্মোৎসর্গের পর মজফরপুরের ঘটনায় পরাধীন জাতির হৃদয়ে জেগে উঠেছিল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। সারা দেশে একটা জেহাদি বেপরোয়া মনোভাবের প্রতিফলন ঘটল। চরমপন্থী নেতা বালগঙ্গাধর তিলক কিংসফোর্ডের ওপর বোমা নিক্ষেপকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করলেন। যার জন্য তিলককে গ্রেফতার করা হল। তার বিরুদ্ধে আনা হলো রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ। তাঁকে নির্বাসনদণ্ড দেওয়া হল। তাঁর মুক্তির দাবিতে বোম্বের মিলের শ্রমিকরা ধর্মঘট করলেন। সেই শ্রমিকদের উপর পুলিশের বেপরোয়া আক্রমণ শুরু হল। এইভাবে ক্ষুদিরামের আত্মোৎসর্গের ঘটনা গোটা দেশের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে আরও শক্তিশালী করেছিল।

অথচ আজ আমরা এই বীর সংগ্রামীদের ভুলতে বসেছি। ভুলে গেছি বললেও ভুল হবে, তাঁদের ভুলিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। রাষ্ট্রের পরিচালকরা এমন এক সমাজ ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছেন যেখানে মানুষ হবার প্রক্রিয়াটাই ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। যাতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মেরুদণ্ড সোজা করে, মাথা উঁচু করে, প্রতিবাদ করার জন্য কোনও ক্ষুদিরাম জন্ম নিতে না পারে।

'অভয় টু' নামক ওয়েব সিরিজে ক্রিমিনালদের ছবির তালিকায় ক্ষুদিরামকে সামিল করার ঘটনা সেটাই আবার প্রমাণ করল। এটা বিক্ষিপ্ত কোনও ঘটনা বলে মনে করি না। যেভাবে আমাদের তাঁদের ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে, তাঁদের সংগ্রামকে খাটো করার চেষ্টা চলছে, এ তারই ফলশ্রুতি।

গৌতম দাস
মালদা

মৈপীঠে দুর্গত মানুষের পাশে ডিএসও এবং এমএসএস

৪ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগণার মৈপীঠে শাসক তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা এলাকার মানুষের ওপর ব্যাপক হামলা চালায়। প্রাণ হারান এস ইউ সি আই (সি)-র জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, বিশিষ্ট নেতা সুধাংশু জানা। আহত হন অনেকে। শত শত ঘরবাড়ি ভেঙে ও পুড়িয়ে দেওয়া হয়। নিঃস্ব অবস্থায় মানুষ রাস্তায় এসে দাঁড়ান। এই পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় এআইডিএসও। ১৭ আগস্ট সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে মৈপীঠের দুই শতাধিক ছাত্রছাত্রীর হাতে বই, খাতা, ব্যাগ, পেন, পেন্সিল সহ নানা শিক্ষা সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুশান্ত ঢালী এবং জেলা সম্পাদক অরবিন্দ প্রামাণিক।

একটি ওয়েব সিরিজে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার বীর বিপ্লবী ক্ষুদিরামকে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে তুলে ধরার বিরুদ্ধে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীরা তীব্র ধিক্কার জানান।

১৬ আগস্ট এআইএমএসএস-এর রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে মৈপীঠে তৃণমূল দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবে ঘরবাড়ি হারানো ১০৮ টি পরিবারের হাতে গৃহস্থলীর সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন কমরেড মাধবী প্রামাণিক, সফি পৈলান, রুনা পুরকাইত ও কল্পনা দত্ত। নিহত নেতা কমরেড সুধাংশু জানার স্ত্রী কমরেড গীতা জানাও উপস্থিত ছিলেন।

করোনা পরীক্ষা ও সেফ হোম বাড়ানোর দাবি

কোভিড-১৯ সারা দেশে ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করছে। রাজ্য জুড়ে প্রতিদিন কোভিড সংক্রমিতের সংখ্যা লাফিয়ে বাড়ছে। অথচ হাসপাতালগুলিতে বেড সেই অনুযায়ী বাড়ছে না। অধিকাংশ বাড়িতেই সংক্রমিত ব্যক্তিকে আলাদা রাখার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। সরকারি উদ্যোগে, রোগের তীব্রতা কম এমন অসুস্থদের যে সেফ হোমগুলিতে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে, সেগুলির সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত কম। আবার সব হোমগুলিতে রোগীদের সুস্থ করে তোলার উপযোগী ব্যবস্থাও নেই। এই পরিস্থিতিতে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ১৭ আগস্ট জেলার সিএমওএইচ-কে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। স্মারকলিপিতে প্রত্যেকটি সেফ হোমে রোগীদের জন্য ক) পরিচ্ছন্ন সামগ্রিক পরিবেশ বজায় রাখা, খ) দূরত্ব রেখে বিছানার ব্যবস্থা, গ) রোগীর উপযোগী পথ্য ও পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ, ঘ) পরিচ্ছন্ন শৌচাগার, ঙ) চিকিৎসকদের নিয়মিত পরিদর্শন ও উপদেশ, চ) উপযুক্ত ট্রেনিং ও সুরক্ষার ব্যবস্থা সহ নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়োগ, ছ) অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ ও জ) অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয়।

সংগঠনের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রতিমা জানা ও তমলুক শাখার সভাপতি চন্দনা জানা বলেন, তাঁদের আরও দাবি— জেলায় করোনা পরীক্ষার সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হোক। তমলুক জেলা হাসপাতালে অবিলম্বে করোনা পরীক্ষা শুরু করার পাশাপাশি উপযুক্ত ব্যবস্থাসহ প্রচুর সংখ্যক সেফ হোম করার দাবিও জানানো হয়েছে।

চিকিৎসা পরিকাঠামোর উন্নয়ন ও এলাকায় পর্যাপ্ত সেফ হোম রাখার দাবিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে ঠাকুরপুকুর মহেশতলা বিডিও-র কাছে ১৭ আগস্ট স্মারকলিপি দেওয়া হয়। একই দাবিতে ওই দিন সংগঠনের পক্ষ থেকে সরশুনা হেলথ সেন্টারে বিএমওএইচ-এর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

রাজপুর-সোনারপুর পুরসভায় করোনা টেস্টের দাবিতে ডেপুটেশন

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর হরিনাভি ইউনিটের পক্ষ থেকে এলাকায় করোনা পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধি, অ্যাম্বুলেন্স ও অক্সিজেনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা, অধিক সংখ্যায় সেফ হোম তৈরি ও করোনা চিকিৎসার সামগ্রিক উন্নয়নের দাবিতে ১৯ আগস্ট রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। প্রশাসক দাবিগুলি যুক্তিসম্মত বলে মেনে নেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। কমরেড দিবাকর হালদার ও কমরেড মিহির রায়ের নেতৃত্বে এই কর্মসূচিতে দলের কর্মীরা ও এলাকার মানুষ যোগ দেন।

সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ

কলকাতার ধর্মতলায় আশুতোষ মূর্তির সামনে প্রতিবাদ

কলকাতার হাজরা মোড়ে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০-র প্রতিলিপিতে অগ্নিসংযোগ করা হচ্ছে

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার চূড়ান্ত শিক্ষাস্বার্থবিরোধী জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ পার্লামেন্টকে এড়িয়ে ক্যাবিনেটে পাশ করিয়েছে। এর বিরুদ্ধে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির পক্ষ থেকে ১৮ আগস্ট সারা ভারত প্রতিবাদ দিবসের ডাক দেওয়া হয়। ওই দিন রাজ্যের বিভিন্ন জেলাশহর সহ ৬৫টিরও বেশি জায়গায় রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ সংগঠিত করা হয়। পাঁচ হাজারেরও বেশি মানুষ এই প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করেন। উত্তরবঙ্গের কোচবিহারে এবং দক্ষিণবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় সংগঠিত হওয়া প্রতিবাদ কর্মসূচি ছিল চোখে পড়ার মতো। কলকাতার ধর্মতলায় আশুতোষ মূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদক অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর ও সহ-সম্পাদক ডঃ মৃদুল দাস বক্তব্য রাখেন এবং সর্বভারতীয় কমিটির সদস্য কার্তিক সাহা জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০-র প্রতিলিপিতে অগ্নিসংযোগ করেন। উপস্থিত সাধারণ মানুষ এই কর্মসূচিকে সোচ্চারে সমর্থন করেন।

যথেচ্ছ বিদ্যুৎ বিল বাতিলের দাবিতে রাজ্যব্যাপী প্রতিবাদ দিবস পালন অ্যাবেকা-র

কলকাতার তারতলায় সিইএসসি দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ

কলকাতার রাসবিহারী মোড়

গড় বিলের পর মিটার রিডিং-এর বিশাল অঙ্কের বিল রি-জেনারেট করতে হবে। প্রতি মাসে ২০০ ইউনিট বিদ্যুৎ বিনামূল্যে দিতে হবে। ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ সহ সমস্ত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিদ্যুৎ বন্টন ব্যবস্থাকে ব্যক্তি পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে। কয়লাখনিগুলিকে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের কাছে বিক্রি করা চলবে না। জনবিরোধী বিদ্যুৎ আইন (সংশোধনী) বিল-২০২০ প্রত্যাহার করতে হবে। এই দাবিতে ১৮ আগস্ট অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা)-র ডাকে সারা বাংলা প্রতিবাদ দিবস পালন করা হয়। জেলায় জেলায় বিদ্যুৎ অফিসগুলিতে বিক্ষোভ দেখানো হয় ও স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে এই স্বেচ্ছাচারী বিদ্যুৎ বিলের প্রতিবাদে সমস্ত বিদ্যুৎ গ্রাহকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়।

আন্দোলনের জয়ে ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন জানাল ডিএসও

এআইডিএসও-র নেতৃত্বে ছাত্রসমাজের আন্দোলনের চাপে ১৩ আগস্ট রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী কলেজের ফর্ম ফিল আপের চার্জ মকুবের কথা ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে সংগ্রামী ছাত্রসমাজকে অভিনন্দন জানানো হয়। কোচবিহার জেলার দিনহাটায় ১৪ আগস্ট মিছিল করা হয়। চওড়াহাটে পথসভা হয়। করোনা অতিমারির সংকটজনক পরিস্থিতিতে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফি সহ সমস্ত রকম ফি মকুবের দাবিতে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য কমিটি ও কোচবিহার জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড আসিফ আলম, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও দিনহাটা লোকাল কমিটির পক্ষে কমরেড স্বপ্না বর্মন, কমরেড তাপসী বর্মন প্রমুখ। তাঁরা দাবি করেন, ইতিমধ্যে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে নেওয়া ফর্ম ফিল আপের টাকা ফেরত দিতে হবে। দাবি মানা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে বলে তাঁরা জানান।

বেসরকারি চিকিৎসায় মুনাফার কুৎসিত রূপ

প্রথমে টাকা জমা করতে হবে হাসপাতালের অ্যাকাউন্টে, তারপর রোগীর চিকিৎসা। মরণাপন্ন রোগী ধুঁকতে ধুঁকতে বাইরে পড়ে থেকে মরে যাবে। আমরা সভ্য সমাজে বাস করি, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অভূতপূর্ব অগ্রগতির বড়াই করি, কয়েক ফুট দূরত্বে অক্সিজেন সিলিন্ডার, সামান্য অক্সিজেন দিলে মানুষটার প্রাণ বাঁচে। কিন্তু না, এমনটা হওয়ার নয়— আগে অ্যাকাউন্টে টাকা জমা করতে হবে। আপনি হয়ত ভাবছেন, এ হাসপাতাল না কসাইখানা?

হ্যাঁ, এটা হাসপাতাল। বেসরকারি হাসপাতাল। করোনা অতিমারি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেসরকারিকরণের বিষময় ফল কত মারাত্মক হতে পারে! তবে এ তো আর হঠাৎ করে হয়নি! বহু দিন ধরে এই বিষবৃক্ষ ধীরে ধীরে বেড়ে উঠে আজ ফুলে-ফলে পল্লবিত হয়ে সমাজের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে। কীভাবে এমন হতে পারল? কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি জনসাধারণের চিকিৎসার দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে মালিকদের অবাধে ছাড় দিয়ে গেছে স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যবসা করার জন্য। সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে পরিকল্পিত ভাবে, যাতে অসহায় মানুষ যেতে বাধ্য হয় বেসরকারি কর্পোরেট হাসপাতালগুলিতে। চিকিৎসা একটা অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা, যে কোনও সভ্য দেশে যা জনগণের বিনামূল্যে পাওয়ার কথা, তাকে আজ সম্পূর্ণ রূপে একটা লাভজনক পণ্যে পরিণত করা হয়েছে। আমরা আগেও দেখেছি, বেসরকারি হাসপাতালে টাকা না মেটালে মৃতদেহ আটকে রাখা, চিকিৎসা না করে লক্ষ লক্ষ টাকার বিল করা— এসব ছিলই। এই করোনা পরিস্থিতিতে আমরা দেখছি এর নৃশংস নগ্ন রূপ।

অথচ এখনও পর্যন্ত সরকার কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে পারল না। একটার পর একটা দুর্নীতির খবর আসছে, একটার পর একটা দুঃখজনক মৃত্যু— সরকার নির্বিকার। বেসরকারি হাসপাতালের এই ব্যবসা বন্ধ করার জন্য আজ পর্যন্ত কোনও সরকারি নির্দেশ জারি হল না। একটার পর একটা অনুরোধের বার্তা গেল শুধু। কোনও অপরাধীর কোনও শাস্তি হল না। মানুষ যখন তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়ল সরকারের বিরুদ্ধে, বিগত দিনের অনেক ঘটনার মতোই, মালিকদের দুর্নীতি আড়াল করার জন্য আবারও একটা কমিটি করে দেওয়া হল। মনে রাখতে হবে একই রকম ভাবে বেসরকারি স্কুলগুলিতে লাগামছাড়া ফি-এর প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে অভিভাবকরা যখন তীব্র আন্দোলনে ফেটে পড়েছেন, লকডাউনেও স্কুলের বিদ্যুতের বিল, স্কুল বাসের ভাড়া, ডেভেলপমেন্ট ফির নামে স্কুল-মালিকরা লুট করছে লক্ষ লক্ষ টাকা, রাজ্য জুড়ে অভিভাবকরা প্রতিবাদে পথে নেমে এসেছেন, সেই সময়ও ক্ষোভ সামাল দিতে কমিটি করে দেওয়া হয়েছে। বাস্তব অভিজ্ঞতা বলে, অধিকাংশ এইরকম কমিটিই অশ্বডিম্ব ছাড়া আর কিছুই প্রসব করে না। এবারেও তার কোনও ব্যতিক্রম হবে বলে মনে হয় না।

আজ বেসরকারি হাসপাতালের বেআব্রু লালসার কুৎসিত রূপ দেখে, মানুষের জীবন বাজি রেখে মালিকের মুনাফা লোটার নির্মমতায় হয়ত মনে হচ্ছে, বেসরকারি হাসপাতাল ভাল নয়, কিংবা মনে হচ্ছে, লাভ করুক, তাই বলে এত! তিন লাখ নাকি পঞ্চাশ হাজার— এ নিয়ে বিতর্কে আসর গরম করছে কেউ কেউ। কিন্তু বিড়ালকে মাছ পাহারা দিতে বললে তার ফল যা হওয়ার তা হবেই। বেসরকারিকরণ হবে, আর ব্যবসা হবে না, এ তো সোনার পাথরবাটি! পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত নিয়মই হল, মালিক ব্যবসা করে সর্বোচ্চ মুনাফার জন্য। সরকারগুলি এইসব মালিকের সেবাদাস, তাই স্বাস্থ্য, শিক্ষা থেকে শুরু করে রেল, কয়লা, বিদ্যুৎ সবকিছুরই বেসরকারিকরণ করা হচ্ছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে অবাধে চলছে লুট। হাসপাতালের করিডোরে পড়ে পড়ে মৃত্যু চোখে দেখা যায়, বাকি ক্ষেত্রগুলিতেও মালিকের লাভ করার উন্মত্ত লোভ কত লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের জীবন কেড়ে নেয়, তার হিসেব কে রাখে! কোটি কোটি বেকার দেশ জুড়ে। তার উপর করোনার দুর্বিষহ অবস্থার সুযোগ নিয়ে সরকার মালিকের স্বার্থে শ্রম আইন সংশোধন করল, শ্রমের সময় বাড়ল, মজুরি কমালো, রেল সহ সমস্ত ক্ষেত্রে অসংখ্য ছাঁটাই। না খেতে পাওয়া মানুষের সামনে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনও পথ খোলা রইল না। এই করোনা অতিমারি দেখিয়ে দিল, বিশ্বের কোনও পুঁজিবাদী দেশই জনস্বার্থ দেখে না। মানুষ বাঁচল কি মরল তাতে কোনও মালিকের কিছু আসে যায় না, তাদের মুনাফা হলেই হল, কোনও সরকারেরও কিছু আসে যায় না, মালিকের সেবা করে ক্ষমতায় টিকে থাকাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য।

তাই অসহায় মানুষের মৃত্যু যে বিবেক-যন্ত্রণা সৃষ্টি করে, তা উপশমের একমাত্র উপায় সমস্ত রকম বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা। সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে আরও উন্নত করে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দাবিতে আন্দোলনই পারে এই নির্মম মৃত্যুস্রোতকে আটকাতে।

১১ আগস্ট ছত্তিশগড়ের দুরগে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম স্মরণ

করোনা পরিস্থিতিতেও বঞ্চনার শিকার আশাকর্মীরা

৫০ হাজারেরও বেশি আশাকর্মী এ রাজ্যে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে বর্তমানের এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা দিয়ে চলেছেন। বিভিন্ন মহল থেকে ফ্রন্টলাইন কর্মী হিসেবে প্রশংসিত হলেও কর্মক্ষেত্রে তাঁদের জন্য প্রায় কোথাও উপযুক্ত সুরক্ষা সরঞ্জাম একেবারেই নেই। মাস্ক, হ্যান্ডস্যানিটাইজার, গ্লাভস হয়ত কোথাও একবার দেওয়া হয়েছে, তা-ও সবার জোটেনি। বাঁচার তাগিদে নিজেদেরই তা কিনে নিতে হচ্ছে। কোটি কোটি টাকার ফান্ডের কথা শোনা যাচ্ছে, তা কোন জীবন রক্ষার জন্য ব্যবহার হচ্ছে তাঁরা জানতে পারছেন না। দিন-রাত কাজ করার কথা আশাদের। দিনে বাড়ি বাড়ি করোনা সার্ভে, মা-শিশুর দেখভাল, এ-সব ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সংক্রামক ও অসংক্রামক উপসর্গের খোঁজখবর নেওয়া, ফিরে এসে আবার সেই জরুরি পরিষেবার জন্য বাড়ি-বাড়ি ঘোরা। সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয়, এই কর্মীরা তাঁদের গার্হস্থ জীবন ও কর্মক্ষেত্র রাত-দিনের এত কাজ দিয়ে মেলাতে পারেন কি না, বা তা বাস্তবে সম্ভব কি না নীতি-নির্ধারকরা তার খবর রাখেন না। বাড়ি বাড়ি সার্ভে করতে গিয়ে বহু জেলাতে কর্মীরা মার খাচ্ছেন, তাঁদের নিরাপত্তার কোনও ব্যবস্থা নেই। যে কাজ করার কথা নয়, যে কাজের ট্রেনিং নেই, যে কাজের কোনও পারিশ্রমিক নেই— তেমন সব কাজ কোথাও জোর করে, কোথাও ভয় দেখিয়ে করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এ অত্যন্ত অন্যায় ও দুঃখজনক ঘটনা।

নিরাপত্তা ও সুরক্ষাবিহীন ভাবে কাজ করতে গিয়ে সারা রাজ্যে একশোর বেশি আশাকর্মীর করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে। অথচ তাঁদের সবার জন্য হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থাটুকুও নিশ্চিত করতে পারছে না সরকার। স্বাস্থ্যকর্মীদের করোনা পজিটিভ হলে চিকিৎসা বাবদ ১ লক্ষ টাকা পাওয়ার কথা। সে কথা তাঁদের জানানোও হচ্ছে না, দেওয়া তো দূরের কথা। এখনও পর্যন্ত কোনও আশাকর্মী সে টাকা পায়নি। জুন মাসে সংবাদমাধ্যমে জানা যায়, রাজ্য সরকার আশা কর্মীদের জন্য উৎসাহ ভাতা ৩৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪৫০০ টাকা করবে। কিন্তু তা শুধু ঘোষণায় থেকে গেল। কেন্দ্রীয় সরকার করোনা পরিষেবার জন্য তিন মাস এক হাজার টাকা করে দিয়ে তা বন্ধ করে দিয়েছে।

বর্তমানে কর্মক্ষেত্রে আশাকর্মীদের দুর্বিষহ অবস্থা। আর্থিক অবস্থাও তলানিতে। কাজ বহুগুণ বেড়েছে। আইটেম অনুযায়ী কাজে যে টাকা কর্মীরা পেতেন, তা-ও কোথাও ঠিক মতো দেওয়া হচ্ছে না। গত মাসে হঠাৎ আশাকর্মীদের একটা করে চাদর দেওয়া হয়েছে। কোন প্রয়োজন মেটানোর জন্য এ চাদর দেওয়া হল তার কোনও উত্তর মেলেনি। হাজার হাজার আশাকর্মীকে একরকম প্রায় বিনা পারিশ্রমিকে যেভাবে খাটিয়ে নেওয়া হচ্ছে তা এককথায় নজিরবিহীন। মাথায় ফুল ছড়িয়ে, রেড রোডে করোনা যোদ্ধা হিসেবে সম্বর্ধনা দিয়ে কি কর্মীদের এই বঞ্চনা ঢাকা যাবে! পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন বারবার দাবি জানিয়েছে, আশা কর্মীদের সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি দিতে হবে, করোনা পরিস্থিতি চলাকালীন ১০,০০০ টাকা মাসিক উৎসাহ ভাতা দিতে হবে, অবসরকালীন সমস্ত ধরনের সুরক্ষা দিতে হবে। অবিলম্বে সরকার দাবিগুলি না মানলে, ইউনিয়ন জানিয়েছে, আশাকর্মীরা কর্মবিরতিতে যেতে বাধ্য হবেন।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০

বিরোধিতার প্রধান কারণগুলি

করোনা বিপর্যয়ে গোটা দেশ যখন সন্ত্রস্ত, বিপদগ্রস্ত, সেই সময়ে রাজ্য সরকারগুলি এবং শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংগঠনের সঙ্গে কোনও রকম আলাপ-আলোচনা ছাড়াই কেন্দ্রের বিজেপি সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ ঘোষণা করে দিল। এই শিক্ষানীতিটির খসড়া যখন প্রকাশিত হয়েছিল, তখন থেকেই যুক্তির আলোয় সেটি পর্যালোচনা করে সংগ্রামী ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও এর নানা ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক দিক চিহ্নিত করা ও সে সম্পর্কে জনমত গড়ে তোলার কাজ চালিয়ে আসছিল। কেন জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ বিপজ্জনক, সে সম্পর্কে এই সংগঠন সংক্ষেপে যে সুনির্দিষ্ট বিষয়গুলি তুলে ধরেছে, বিষয়টি বুঝতে সাহায্য হবে মনে করে আমরা তা প্রকাশ করলাম।

শিক্ষা আমাদের অধিকার। দেশের শাসকরাও অন্তত মুখে স্বীকার করে, শিক্ষার অধিকার দেশের মানুষের একটি মৌলিক অধিকার। কিন্তু সরকারি নীতিতে তার প্রতিফলন কতটুকু? দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যারা সরাসরি যুক্ত, সেই শিক্ষাবিদ, শিক্ষকসমাজ, গবেষক, অভিভাবক, ছাত্রসহ ব্যাপক অংশের শিক্ষানুরাগী মানুষের তুলে ধরা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবগুলিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ তে কেন্দ্রীয় সরকার সিলমোহর লাগিয়ে দিল এমন একটা সময়ে যখন গোটা দেশ করোনা অতিমারির ফলে অর্থনৈতিকভাবে চরম সংকটগ্রস্ত এবং জীবন-মৃত্যুর লড়াইয়ে ব্যস্ত।

ভারতের মতো একটি বিশাল এবং বহু ভাষা, বহু সংস্কৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে জাতীয় শিক্ষানীতির মতো বিষয়কে রূপ দেওয়া নিঃসন্দেহে একটি কঠিন এবং ব্যাপক পরিসরের কাজ। তাই প্রয়োজন দেশের সমস্ত স্তরের শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, সমাজবিজ্ঞানীদের নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা, যে কমিটি এই বিষয়টির সঙ্গে যুক্ত সমস্যাগুলির নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানসম্মত সমাধান বের করবে। এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গণতান্ত্রিক কর্তব্যটি জাতীয় শিক্ষানীতির খসড়া প্রস্তুতকারী কমিটি তাদের চিন্তাতেই রাখেনি। তাই এই জাতীয় শিক্ষানীতি-কে সরকারপন্থী আমলাদের চিন্তাপ্রসূত খসড়ার বাইরে আর কিছু বলা যায় না। এমনকি জাতীয় শিক্ষানীতির মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে খসড়া প্রস্তুত করার আগে, শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে জাতীয় স্তরে একটি বিতর্ক আয়োজনের কথাও তাঁরা ধর্তব্যের মধ্যে রাখেননি। শিক্ষা ব্যবস্থা কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের যৌথ আওতায় থাকা সত্ত্বেও, শিক্ষানীতি প্রণয়নে রাজ্য সরকারগুলির মতামত, খসড়া প্রণয়নকারী কর্তাব্যক্তিরা সুকৌশলে এড়িয়ে গেছে। উপরন্তু শিক্ষার বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ, সাম্প্রদায়িকীকরন, ব্যয় বৃদ্ধি, অপরিমিত সরকারি অনুদান কমানোর সমস্যাগুলি সমাধানের কোনও উল্লেখ না করে জাতীয় শিক্ষানীতি এই সমস্যাগুলোকে আইনসিদ্ধ করার দিকে এক ঘৃণ্য পদক্ষেপ।

যে পদ্ধতিতে এই শিক্ষানীতির খসড়া তৈরি করা হল এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রক তা গ্রহণ করল, তা সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক এবং একতরফা ভাবেই এই শিক্ষানীতিকে রাজ্যগুলির উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এআইডিএসও স্পষ্ট ভাবে এই শিক্ষানীতি বাতিলের দাবি জানাচ্ছে। পাশাপাশি শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ, সাম্প্রদায়িকীকরণ, কেন্দ্রীকরণ এবং সর্বাত্মক ফ্যাসিবাদ কায়েমের ছক এই শিক্ষানীতিকে বাতিল করতে সরকারকে বাধ্য করার আন্দোলনে ভারতের প্রতিটি মানুষকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে।

এখন এই নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির বিভিন্ন দিকগুলি খতিয়ে দেখা যাক।

১) যে পদ্ধতিতে এই শিক্ষানীতির খসড়া তৈরি হল এবং যেভাবে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, শিক্ষক ও ছাত্রদের মতামত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে দেশের সাধারণ মানুষ ও রাজ্য সরকারগুলির ওপর তা চাপিয়ে দিচ্ছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রক, তা চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক ও একতরফা।

২) পূর্বের স্কুল পাঠ্যক্রম ১০+২ -এর পরিবর্তে তিন বছরের প্রাক-প্রাথমিক যুক্ত করে গোটা প্রক্রিয়াটিকে ৫+৩+৩+৪ -এর পুনর্গঠন প্রক্রিয়াটিকে বর্তমান শিক্ষানীতিকে 'বৈপ্লবিক' বলে সুপারিশ করা হয়েছে। অথচ এই শিক্ষানীতির বাস্তব রূপ নিয়ে কোনও 'বৈপ্লবিক' দৃষ্টিভঙ্গি তাদের মধ্যে দেখা যায়নি। এই স্তরের শিক্ষার দায়িত্ব তারা তুলে দিচ্ছে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির হাতে, যেখানে তাদের এই রঙিন নকশা রূপদানের ন্যূনতম পরিকাঠামোটুকুও নেই, সুপ্রশিক্ষিত শিক্ষক তো দূরের কথা। প্রাক-বিদ্যালয় পঠন-পাঠন এবং সর্বজনীন শিক্ষার স্বার্থে সরকারের উচিত ছিল পঠন-পাঠনের সমস্ত দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করে শিক্ষার যাবতীয় খরচ বহন করা। যেহেতু জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে নীরব এবং তারা শিক্ষার ব্যয় বহনের কোনও উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করেনি, ফলে স্বাভাবিক ভাবেই তাদের এই 'বৈপ্লবিক' শিক্ষানীতি প্রাক-প্রাথমিক স্তরে সর্বাত্মক বেসরকারিকরণকেই উৎসাহিত করবে।

৩) এই শিক্ষানীতি প্রাক-প্রাথমিকের তিন বছর এবং গ্রেড ১ ও ২, অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি— এই দু'বছর মিলিয়ে মোট পাঁচ বছরকে একটি ভিত্তিমূলক স্তর হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং প্রথাগত শিক্ষার পরিবর্তে শিশুদের জন্য খেলাধুলা ভিত্তিক শিক্ষার সুপারিশ করেছে, যা সর্বশিক্ষা অভিযান, ডিপিইপি-এর ধারাবাহিকতায় সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে পাঠরত লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর শিক্ষণ ও শিক্ষাদানকেই বিপন্ন করে তুলবে।

৪) তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণিকে তারা প্রস্তুতি ধাপ বলছেন। সেখানে কিছু কিছু পাঠ্যবই থাকলেও প্রস্তাব অনুযায়ী বিষয় ভিত্তিক নিয়মিত পাঠ শুরু হবে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে। অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা প্রায় কিছুই পড়বে না। বিশ্বব্যাঙ্ক অনুমোদিত ডিপিইপি কর্তৃক শিক্ষাদান পদ্ধতিতে যে বিতর্কমূলক পরিবর্তন করা হয়েছিল তা ভারত সহ গোটা বিশ্বে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। শিক্ষাগ্রহণের সময়-পরীক্ষিত প্রক্রিয়াতে হস্তক্ষেপ করা বিপর্যয় ডেকে আনছে এবং তা ইতিমধ্যেই শিক্ষার মানকে তলানিতে ঠেলে দিচ্ছে।

আজকের বিদ্যালয়গুলিতে বিপর্যস্ত শিক্ষা ব্যবস্থার মূল কারণগুলি হল, ক) দশম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল না থাকা, খ) শূন্যপদ পূরণ করতে ব্যর্থতার ফলে স্থায়ী শিক্ষকের তীব্র ঘাটতি এবং পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাব, গ) সরকারি অনুদানের ক্রমাগত সংকোচন এবং ঘ) অ্যাকাডেমিক কাজের বাইরে শিক্ষকদের ব্যস্ত থাকা ইত্যাদি।

শিক্ষার এই মূল সমস্যাগুলি সমাধানের চেষ্টা না করে আজ পর্যন্ত সব জাতীয় শিক্ষানীতি নির্ধারক কমিটি এবং সরকারগুলি শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন কিংবা শিক্ষাদানের পদ্ধতিতে কাটাছেঁড়া এবং সিলেবাস পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই তাদের শাসনকে সুদৃঢ় করার চেষ্টা করেছে।

৫) মাধ্যমিক স্তরে (নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি) এই শিক্ষানীতির সুপারিশ— পড়াশোনার ধরন হবে মাল্টিডিসিপ্লিনারি। অর্থাৎ বিজ্ঞান, কলা, সাহিত্য, খেলা, গান সহ সকল বিষয় এক সঙ্গে চর্চার সুযোগ। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত কোনও প্রথাগত বই থাকবে না। অথচ অষ্টম শ্রেণির পর শিক্ষার্থীর উপর চাপানো হবে ১২টি বিষয়ের বোঝা, সাথে ৪০টি ঐচ্ছিক বিষয়। এই নীতি শুধু অবৈজ্ঞানিকই নয়, ছাত্রস্বার্থ বিরোধী, যা শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপকেই আরও বাড়িয়ে তুলবে। স্কুলস্তর থেকে শুরু করে কলেজস্তর পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষানীতি শিক্ষার্থীদের মাল্টিডিসিপ্লিনারি পদ্ধতিতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়ার সুযোগ করে দেওয়াকে তারাল 'বৈপ্লবিক' বলে অভিহিত করেছে। বিজ্ঞান বিভাগে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও গণিত, কলা বিভাগের ইতিহাস, অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়গুলি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এবং একে অপরের পরিপূরক। এই বিষয়গুলি দীর্ঘ সময় ধরে সিলেবাসে যথার্থ কম্বিনেশন হিসেবে পরীক্ষিত। বিজ্ঞান বিভাগে গণিত এবং রসায়নকে আলাদা করে দিলে কিংবা কলা বিভাগে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে আলাদা করে দিলে শিক্ষার্থীদের বিষয় সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে তা বাধা তৈরি করবে। মাল্টিডিসিপ্লিনারি শিক্ষায় একজন ছাত্র বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে কিছু তথ্য জানতে পারে, কিন্তু তাকে কি শিক্ষা বলা যায়? স্মরণ করা যেতে পারে ভারতের নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা। তিনি বলেছিলেন, 'শুধু লেখা, পড়া শেখা, অঙ্ক করাটাকেই শিক্ষা বলে না। শিক্ষার্থীর পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান প্রদান করার প্রয়োজনে ভূগোল, জ্যামিতি, সাহিত্য, প্রাকৃতিক দর্শন ও নৈতিক দর্শনের পাঠ, পলিটিক্যাল ইকোনমি ইত্যাদি পড়ানো দরকার। আমাদের এমন শিক্ষক চাই যারা বাংলা এবং ইংরেজি জানে এবং সমস্ত ধর্মীয় সংস্কার থেকে মুক্ত।'

৬) জাতীয় শিক্ষানীতি ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে ইন্টার্নশিপ সহ বৃত্তিমুখী শিক্ষা চালু করার সুপারিশ করেছে। সমস্ত বড় মানুষই বলেছেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে চিন্তায় মননে চরিত্রে যথার্থ মানুষ তৈরি করা। শিক্ষানীতির এই প্রস্তাবকে শুধু বৃত্তিমুখী শিক্ষার উপরে জোর দেওয়া বললে ভুল হবে, এটা হল শিক্ষার বৃত্তিমুখীকরণ। শিক্ষার এই বৃত্তিমুখীকরণ দীর্ঘ সময় ধরে পরীক্ষিত প্রথাগত পদ্ধতিতে পঠন-পাঠন ও জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করবে। কেবলমাত্র কিছু বিষয়ে বৃত্তিমুখী প্রশিক্ষণ দেওয়া শিক্ষা হতে পারে না। 'কোনও একটি বিষয়ে মানুষকে বিশেষজ্ঞ বানানোই যথেষ্ট নয়। সুপ্রশিক্ষিত করে তাকে ভালো যন্ত্র বানানো যেতে পারে, কিন্তু তার মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটানো সম্ভব নয়। একজন শিক্ষার্থীর সুন্দর-অসুন্দরের চেতনা, ভালো-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা এবং মূল্যবোধের প্রতি আকর্ষণ থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। না হলে কেবল কিছু বিষয়ে বিশেষত্ব অর্জন করলে তাকে প্রশিক্ষিত কুকুর বলা যায়, উন্নত মানুষ নয়। অপরিণত অবস্থাতেই বিশেষজ্ঞ করবার প্রচেষ্টা এবং প্রতিযোগিতামূলক বিষয়গুলিতে অত্যাধিক গুরুত্ব দেওয়া মানবিক দিক থেকে একজনকে মুষড়ে ফেলে এবং তার সংস্কৃতি জগতের পরিবর্তন ঘটায়' (এডুকেশন ফর ইন্ডিপেন্ডেন্ট থট ঃ অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, ১৯৫২)। মহান মানবতাবাদী বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের এই ঐতিহাসিক উক্তির মর্যাদা আমরা কীভাবে দেব?

৭) এই শিক্ষানীতিতে ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থীকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। দেশে হাজার হাজার আইটিআই এবং ডিপ্লোমাধারীরা চাকরির জন্য রাস্তায় রাস্তায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হাজার হাজার ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, ফার্মাসিস্ট, নার্স সহ আরও অনেকে কর্মহীন হয়ে দিন কাটাচ্ছেন। অনেকেই পেটের তাগিদে এমন কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন যা তাঁদের বিষয় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই যখন অবস্থা, তখন কী করে বৃত্তি শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত শিক্ষার্থীর জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে পারে? এভাবে চাকরির মিথ্যা ফানুস ওড়ানোর দ্বারা শিক্ষার্থীরা প্রকৃত শিক্ষার সুযোগ থেকে যেমন বঞ্চিত হবেন, তেমনই তাঁদের কর্মসংস্থানও হবে না।

৮) স্কুল কমপ্লেক্স স্থাপনে জোর দেওয়া হয়েছে এই শিক্ষানীতিতে। জাতীয় শিক্ষানীতির খসড়ায় স্কুল কমপ্লেক্স-এর প্রস্তাবে বলা হয়েছে, প্রাক-প্রাথমিক থেকে শুরু করে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত স্কুলগুলিকে এই স্কুল কমপ্লেক্স-এর মাধ্যমে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসা হবে। বলা হচ্ছে এখানে কারও কোনও সমস্যা হলে অন্যেরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। এক কথায় স্কুলগুলিতে শিক্ষক নিয়োগ, পরিকাঠামো তৈরি, গ্রন্থাগার তৈরি সহ বহু বিষয়ে সরকারি ব্যর্থতা স্বীকার করে, সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিষয় থেকে সরকারের হাত গুটিয়ে নেওয়ার নামই হল স্কুল কমপ্লেক্স। সমস্ত গালভরা কথার আড়ালে সরকারের গোপন অভিসন্ধি হল, স্কুলগুলিতে সরকারি অনুদান প্রদান, পরিকাঠামো তৈরি, নতুন শিক্ষক নিয়োগ এবং নতুন স্কুল গঠনের সরকারি দায়িত্ব অস্বীকার করা। এই নীতি সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে বন্ধ করার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করবে। বলা হয়েছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ৩০ জনের কম ছাত্র থাকলে সেগুলি বন্ধকরে দেওয়া

দশের পাতায় দেখুন

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০

নয়ের পাতার পর

হবে (সম্মিলিত জেলা শিক্ষা দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় ৬০ শতাংশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ হওয়ার মুখে)। আরও বলা হয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে কেবলমাত্র সেই সমস্ত জেলায় একটি বৃহৎ মাল্টিডিসিপ্লিনারি কলেজ স্থাপন করা হবে যে সমস্ত জেলায় ছাত্র সংখ্যা ন্যূনতম তিন হাজার। বলা হচ্ছে, ২০৪০ সালের মধ্যে জেলায় একটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি হওয়া নির্ভর করবে সেই জেলায় ছাত্র সংখ্যা তিন হাজারের বেশি না কম, তার ওপরে। এর ভয়ঙ্কর পরিণতিতে দেশজুড়ে লক্ষাধিক স্কুল-কলেজ বন্ধকরে দেওয়া হবে। কাছাকাছি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুযোগ কমবে এবং শিক্ষার্থীরা বঞ্চনার শিকার হবে।

৯) জাতীয় শিক্ষানীতি পুনরায় ত্রি-ভাষা ফর্মুলার পক্ষেই প্রস্তাব করেছে। আগের শিক্ষানীতিগুলির মতোই জাতীয় শিক্ষানীতিও ন্যূনতম পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসেবে আঞ্চলিক ভাষা অথবা মাতৃভাষার কথা বলেছে এবং সুপারিশ করেছে, যে তিনটি ভাষায় শিক্ষার্থীরা শিখবে তার মধ্যে দুটি ভাষা ভারতীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই ভ্রান্ত ভাষানীতি এবং ইংরেজি ভাষা চর্চা পঞ্চম শ্রেণি থেকে শুরু করার সুপারিশ ইতিমধ্যে লক্ষ লক্ষ অভিভাবককে বাধ্য করেছে তাদের সন্তানদের বেসরকারি স্কুলে পাঠাতে যেখানে ইংরেজি চর্চার সুযোগ রয়েছে প্রথম শ্রেণি থেকেই। কিন্তু অবাক করার মতো ঘটনা এই যে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি এই ভাষানীতির সুপারিশ মেনে তো চলেইনি বরং মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের বিষয়টিকেও তারা এড়িয়ে গেছে সরকারের নাকের ডগায় বসে। ফলে পঠন-পাঠনের মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষা শুধু সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতেই থেকে গেলল। দেশের প্রায় ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থী যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়ে তারা এই ভাষানীতিকে ঠাট্টায় পর্যবসিত করেছে। অথচ জাতীয় শিক্ষানীতি সরকারি স্কুলগুলিতে প্রথম শ্রেণি থেকে ইংরেজি ভাষা চালুর বিষয়ে একটি মাত্র কথা খরচেরও প্রয়োজন বোধ করেনি। মাতৃভাষা ও ইংরেজি নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত 'দ্বি-ভাষাতত্ত্বে'র কথা এআইডিএসও ছয় দশক ধরে জানিয়ে আসছে। এই 'দ্বি-ভাষাতত্ত্ব' অনুযায়ী প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত পাঠদানের মাধ্যম হবে মাতৃভাষা এবং ইংরেজি ভাষাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে প্রথম শ্রেণি থেকেই পড়াতে হবে। কারণ ইংরেজি ভাষা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং অবশ্যই তা বিশ্বের সমস্ত জ্ঞানভাণ্ডারে বিচরণের মূল চাবিকাঠি। এছাড়াও বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম।

জনস্বার্থের কথা ভেবে এই 'দ্বি-ভাষানীতি' প্রবর্তনের পরিবর্তে ১৯৬০ সাল থেকে এ পর্যন্ত সমস্ত ক্ষমতাসীন সরকারগুলি 'ত্রি-ভাষাতত্ত্ব'-কে জোর করে চাপিয়ে দিতে চেয়েছে। যে 'ত্রি-ভাষানীতি'-র সুপারিশ জাতীয় শিক্ষানীতি করেছে তা বৈষম্যমূলক এবং দরিদ্র মানুষের প্রতি বঞ্চনার নামান্তর।

১০) বলা হয়েছে, সংস্কৃত হবে ঐচ্ছিক এবং তিনটি শিক্ষণীয় ভাষার মধ্যে একটিয় ঐচ্ছিক করার অজুহাতে সংস্কৃতকে আবশ্যিক হিসেবে আরোপিত করার অনেক ইঙ্গিত রয়েছে এই নীতিতে। যেকোনও ভাষা শিক্ষার নির্ণায়ক দিকগুলি হল, ক) সেই ভাষাকে হতে হবে সজীব এবং একটি বড় অংশের মানুষ যেন সেই ভাষায় কথা বলে। খ) সেই ভাষা হতে হবে বোধগম্য এবং বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারকে আয়ত্ত করতে সেই ভাষা সাহায্য করবে। গ) সেই ভাষা আমাদের চাকরি ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। যেহেতু সংস্কৃত একটি বিলুপ্ত ভাষা, লোকে আর সে ভাষায় কথা বলে না, তাই সংস্কৃত শিক্ষার মাধ্যমে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার আয়ত্ত করা বা চাকরি ক্ষেত্রে সাহায্য— কোনওটাই সম্ভব নয় এবং সে কারণে এই ভাষার শিক্ষা সময় ও সম্পদ উভয়েরই অপচয়। এই অবস্থায়, কোটি কোটি টাকা খরচ করে সরকারের সংস্কৃত ভাষার প্রসারণের চেষ্টা নিন্দনীয় এবং সাধারণ মানুষের টাকার অপব্যবহার। ভাষা হিসেবে সংস্কৃত সমৃদ্ধ হলেও গ্রিক বা ল্যাটিনের মতো প্রাচীন ভাষাগুলির মতোই বিলুপ্ত। অতএব এটা সুস্পষ্ট যে, সংস্কৃত ভাষা আরোপ এবং 'শিক্ষানীতির ভারতীয়করণ' আসলে বিজেপির রাজনৈতিক অভিসন্ধি ছাড়া কিছু নয়।

প্রায় দু'শো বছর আগে ভারতীয় নবজাগরণের অন্যতম উদগাতা রাজা রামমোহন রায় সংস্কৃত সম্পর্কে লিখেছিলেন, '... আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে সরকার হিন্দু পণ্ডিতদের অন্তর্গত সংস্কৃত স্কুল স্থাপন করে জ্ঞান জ্ঞাপনের চেষ্টা করছে। এই ধরনের শিক্ষালয়গুলির বাস্তবিক ক্ষেত্রে সমাজে কোনও গ্রহণযোগ্যতা বা উপকারিতা থাকবেনা। সংস্কৃত শিক্ষা এই দেশকে অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখার জন্য সর্বোত্তম উপায় হিসেবে গণ্য হবে' (সূত্র ঃ ভারতের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে লেখা চিঠি, ১১ ই ডিসেম্বর ১৮২৩)।

১১) এই শিক্ষানীতি স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং সাম্মানিক (ফেলোশিপ)-এর সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষা পরিচালনার জন্য আমলাতান্ত্রিক সংস্থা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছে। ভারতে প্রবেশিকা পরীক্ষাগুলি সব সময়েই দরিদ্র ছাত্রদের স্বার্থবিরোধী। এগুলি কোচিং সেন্টারগুলির মুনাফা লাভে সাহায্য করে এবং শিক্ষার্থীদের ওপর অত্যন্ত মানসিক চাপ সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে অসুস্থ প্রতিযোগিতার জন্ম দেয়। এটি শিক্ষাকে পণ্যে রূপান্তরিত করে। শিক্ষার বিপুল ব্যয় ও কোচিং সেন্টারের খরচের বোঝা বইতে না পেরে হাজার হাজার মেধাবী দুঃস্থ ছাত্রছাত্রী শিক্ষাজগৎ থেকে দূরে চলে যায়। অভাবী ছাত্রদের স্বার্থের বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে জাতীয় শিক্ষানীতি স্নাতক স্তরেও প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রবর্তনের সুপারিশ করছে যা নিঃসন্দেহে হতাশাজনক।

১২) এই শিক্ষানীতি 'ম্যাসিভ ওপেন অনলাইন কোর্সেস', ই-কোর্স, ভার্চুয়াল ল্যাব প্রবর্তনের ওপর জোর দিয়েছে। অনলাইন শিক্ষা পদ্ধতি মূল প্রথাগত শিক্ষার সহায়ক হতে পারে কিন্তু বিকল্প হতে পারে না। অনলাইন শিক্ষাকে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চলছে যা শিক্ষার বাণিজ্যিকরণ ও বেসরকারিকরণকে আরও দ্রুততার সঙ্গে ত্বরান্বিত করবে। খুব স্বাভাবিকভাবেই অনলাইন শিক্ষা ক্লাসরুমের মধ্যে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ও তাদের মধ্যে আদান-প্রদানের ভূমিকাকে নষ্ট করে শুধু শিক্ষার প্রাণসত্তাকে মেরেই ক্ষান্ত হবে না, প্রথাগত শিক্ষাকে এভাবে গুরুত্বহীন করে দেওয়া হলে শিক্ষা বিস্তারের নতুন নতুন প্রথাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার বিষয়টিও গুরুত্ব হারাবে। এতে সরকারের দায়িত্ব কমবে এবং শিক্ষায় সরকারি ব্যয় কমানো সহজ হয়ে দাঁড়াবে। প্রসঙ্গত ভারতবর্ষে যখন দুর্দশাগ্রস্ত আর্থসামাজিক পরিস্থিতির শিকার হয়ে লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী কম্পিউটার, ইন্টারনেট, স্মার্টফোন এবং আধুনিক প্রযুক্তি থেকে বঞ্চিত, তখন সর্বাত্মক অনলাইন শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের প্রতি চরম বৈষম্যমূলক আচরণ।

১৩) জাতীয় শিক্ষানীতিতে একাধিক প্রবেশ-প্রস্থান বিকল্প সমেত ৪ বছরের স্নাতক ডিগ্রির সুপারিশ করা হয়েছে। দাবি করা হয়েছে যে ৪ বছরের ডিগ্রি প্রোগ্রামটি হবে খুবই নমনীয়। যদি কোনও ছাত্রছাত্রী মাঝপথে পড়া ছেড়ে দেয়, তবে সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবস্থাটি হবে এইরকম ঃ ১ বছরের জন্য একটি ডিপ্লোমা, ২ বছরের পর একটি অ্যাডভান্সড ডিপ্লোমা, ৩ বছরের জন্য ডিগ্রি এবং ৪ বছরের পর ব্যাচেলরস প্রোগ্রাম। দুঃখের বিষয় হল, এই নীতিটি সরকারকে উচ্চমানের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রদানের দায়িত্ব থেকে খুব সুচারুভাবে মুক্ত করে দেবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলি পরিণত হবে বিভিন্ন রকম 'সার্টিফিকেট' কেনাবেচার একটি বাজারে। চাকরি ও সার্টিফিকেটের খুড়োর কল দেখিয়ে নির্লজ্জের মতো ড্রপ আউটকে আইনসিদ্ধকরে দেওয়া হল এই শিক্ষানীতির দ্বারা। শিক্ষিত বেকারের এই বাহিনীতে যে কোনও বেসরকারি সংস্থাই সন্দেহাতীত ভাবে একজন ডিপ্লোমা বা অ্যাডভান্সড ডিপ্লোমাধারীর চাইতে একজন ৪ বছরের ব্যাচেলর ডিগ্রিধারীকে বেছে নিতে চাইবে। উপরন্তু, কোর্সটি মাঝপথে ছেড়ে দেবার পর কোনও ছাত্রী বা ছাত্র আবার পরবর্তীকালে পড়াশুনোয় ফিরবে, এই দাবিটি করার মাধ্যমেই এই নীতি প্রণেতাদের দারিদ্র্য ও বেকারত্বের প্রতি নিছক অসংবেদনশীলতাই প্রকাশ পায় মাত্র। সার্টিফিকেটের অফারগুলি যতই লোভনীয় হোক, অর্থনৈতিক সংকট অধিকাংশ পরিবারে এত প্রকট যে, যারা একবার পড়া ছেড়ে দেয়, তারা শিক্ষাপ্রাঙ্গণে সাধারণত আর কখনই ফিরতে পারে না, যদি না বিনামূল্যে স্কলারশিপ ও নিশ্চিত চাকরি তাদের দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তা হলে এই ৪ বছরের ডিগ্রি প্রোগ্রামটি আনার পেছনে উদ্দেশ্য একটাই দাঁড়ায় যে, যেহেতু পশ্চিমি দেশগুলিতে শিক্ষাব্যবস্থা এভাবে চলে, তাই এই জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকেও এভাবে ৪ বছরের কাঠামোতে পুনর্বিন্যাস করা হলে একজন ভারতীয় ছাত্রী/ছাত্র একটি বিদেশি ডিগ্রি কিনতে পারবে, এবং একজন বিদেশি ছাত্রী/ছাত্র একটি ভারতীয় সার্টিফিকেট কিনতে পারবে। এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে ভারতীয় কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে হাত মেলানো সহজতর করে দেওয়া হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ উচ্চশিক্ষার মূল সমস্যাগুলি এবং বিপুল সংখ্যক ছেলেমেয়ের উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার সমস্যাগুলির কথা আদৌ বলে না। উচ্চশিক্ষার ব্যয়নির্বাহের দায় থেকে সরকারের অব্যাহতি পাওয়ার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এই নীতির ফলেই চারদিকে ব্যাঙের ছাতার মতো বেসরকারি কলেজ গজিয়ে উঠেছে। এর ফলে আমাদের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ৭০ শতাংশেরই মালিকানা বেসরকারি সংস্থার হাতে এবং ক্রমাগত টিউশন ফি ও ভর্তির ফি বৃদ্ধি সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের কলেজেই নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই, উচ্চশিক্ষায় কমসংখ্যক ছাত্রের যুক্ত হওয়ার পিছনের মূল কারণগুলি, যথা— বেকারত্ব, দারিদ্র্য, অস্বাভাবিক বেশি ফি, শিক্ষার সার্বিক বেসরকারিকরণ, সেগুলির সমাধানের কোনও চেষ্টা না করে ডিগ্রি প্রোগ্রামটিকে একটি আন্তর্জাতিক পণ্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি নির্লজ্জভাবে ৪ বছরের ডিগ্রি প্রোগ্রামের পক্ষে সওয়াল করছে। আমরা যেন ভুলে না যাই, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ও বাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা ইতিমধ্যেই এই প্রোগ্রামকে বর্জন করেছেন এবং সেখানে এটির ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়েছে। তাই যেহেতু এই ৪ বছরের প্রোগ্রামটি বৈষম্যমূলক এবং এটি ড্রপ আউটকে আইনি বৈধতা দেয়, তাই এটি বর্জন করতে হবে। স্মরণ করা যেতে পারে, আধুনিক শিক্ষার জনকদের অন্যতম ব্যক্তিত্ব জন স্টুয়ার্ট মিলের কথা। তিনি বলেছেন, "জীবিকা নির্বাহের কিছু বিশেষ ধারায় শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষিত করে তোলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য নয়, সুচতুর আইনজীবী বা চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ার গড়ে তোলা নয়, সুযোগ্য ও সুশিক্ষিত মানুষ গড়ে তোলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আইনজীবী বা চিকিৎসক হওয়ার আগে একজন শিক্ষার্থী একজন মানুষ। যদি তাকে যোগ্য ও বিচক্ষণ মানুষ করে গড়ে তোলা যায়, তারা নিজেরাই নিজেদের যোগ্য ও বিচক্ষণ আইনজীবী বা চিকিৎসক হিসেবে গড়ে তুলবে"।

১৪) জাতীয় শিক্ষানীতি চায় হায়ার এডুকেশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া (এইচইসিআই) নামে একটি নিয়ন্ত্রক আমলাতন্ত্র তৈরি করতে। ইউজিসি (ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন), এআইসিটিই (অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিকাল এডুকেশন), এনসিটিই (ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশন), বিসিআই (বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া), এবং পিসিআই (ফার্মাসি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া) ইত্যাদির মতো অপেক্ষাকৃত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির বদলে একমাত্র এই এইচইসিআই কাজ করবে। এই পথে শিক্ষার ফ্যাসিবাদী কেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হবে এবং এই বিপজ্জনক পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে দেশি ও বিদেশি কর্পোরেট সংস্থাগুলির কাছে শিক্ষাক্ষেত্রকে একটি লাভজনক ব্যবসাক্ষেত্রে পরিণত করা হবে।

১৫) শিক্ষামূলক ও প্রশাসনিক সংস্থাগুলির বিলুপ্তি ও শিক্ষারীতির পুনর্বিন্যাস করবে এই শিক্ষানীতি। বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্য হলো ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে একটি আন্তর্জাতিক পণ্যে পরিণত করা। এর ফলে সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির গণতান্ত্রিক কাঠামোর সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটবে, এবং শিক্ষার উপর সম্পূর্ণ আমলাতান্ত্রিক সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে। এর সঙ্গে সঙ্গে, শিক্ষারীতির পুনর্বিন্যাসের ফলে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও আধুনিকতা

এগারোর পাতায় দেখুন

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০

দশের পাতার পর

প্রসারের প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটবে।

১৬) জাতীয় শিক্ষানীতির সুপারিশে সারা পৃথিবীর সাথে সমস্তরে আসার নামে ১০০টি বিদেশি কলেজকে ভারতে নিজেদের ক্যাম্পাস খোলার অনুমতি দেওয়ার মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে সম্পূর্ণ এফডিআই (ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট বা সরাসরি বিদেশি লগ্নিকরণ) আসতে চলেছে। হার্ভার্ড, অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, ইয়েল, এমআইটির মতো স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এত দূরে ক্যাম্পাস খোলার কোনও গরজ নেই। কারণ মূল বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণগত মান বজায় রাখা অত্যন্ত কঠিন। এভাবে বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলিকে এত সহজে এ দেশে ক্যাম্পাস খোলার অধিকার দেওয়ার ফলে শুধুমাত্র নিম্নমানের প্রতিষ্ঠানগুলিই ভারতে লগ্নি করবে ও সর্বোচ্চ লাভের লক্ষ্যে ভারতের জনগণের উপর বিপুল লুঠ চালাবে। আমাদের ইতিমধ্যেই এরকম সন্দেহজনক ব্যবসামূলক প্রতিষ্ঠানের তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে, যারা ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করে তাদের হাতে মূল্যহীন একটি সার্টিফিকেট ধরিয়ে চম্পট দিয়েছে।

১৭) ভারতীয় শিক্ষা পরিষেবা (ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিস) নামে একটি স্থায়ী আমলাতন্ত্র গঠনের পক্ষে জাতীয় শিক্ষানীতির সুপারিশ হল, সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারদের জন্য সংরক্ষিত পদ থাকবে এবং একটি অ্যাপেক্স অ্যাডভাইসরি বডি বা শীর্ষ উপদেষ্টা সংস্থা 'রাষ্ট্রীয় শিক্ষা আয়োগ' গঠন করা হবে, যার শীর্ষে থাকবেন শিক্ষামন্ত্রী। এটি পরিচালনা করবেন শিক্ষামন্ত্রীর স্থায়ী সচিবেরা। এভাবে সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থাকে 'আরএসএ' নামে একটি কেন্দ্রীয় আমলাতান্ত্রিক সংস্থার অধীনে নিয়ে আসার ফলে শিক্ষার স্বায়ত্তশাসন সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তা 'যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর' পক্ষেও ক্ষতিকারক। এরকম সর্বশক্তিসম্পন্ন একটি সংস্থা ফ্যাসিবাদী হয়ে উঠতে বাধ্য এবং এর ফলে আরএসএ হয়ে উঠবে শাসকদলের হাতের একটি ধারালো অস্ত্র, যার সাহায্যে তারা নিজেদের ভাবাদর্শ অনুযায়ী পাঠ্যসূচি তৈরির মাধ্যমে সারা দেশের শিশুদের চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে।

১৮) 'জ্ঞানমূলক অর্থনীতির' ভেক ধরে, ভারতকে 'জ্ঞান-বিজ্ঞানের পীঠস্থান' রূপে তুলে ধরার চমকপ্রদ, স্লোগানসর্বস্ব কথার আড়ালে সরকারের উদ্দেশ্য দেশি-বিদেশি অর্থপিপাসু ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিদের কাছে এ দেশের বাজার খুলে দিয়ে তাদের অবাধ লুণ্ঠনের রাস্তা করে দেওয়া। ভারতে বর্তমানে অনধিক ২৬ বছর বয়স্ক শিশু-যুবকদের সংখ্যা ৬০ কোটি, যা শিক্ষা বিক্রি করার একটি অত্যন্ত লোভনীয় এবং সম্ভাবনাময় বাজার।

১৯) 'অত্যাবশ্যক বিষয়, দক্ষতা, এবং ধারণাশক্তির সম্মিলিত পাঠক্রম' অংশটিতে জাতীয় শিক্ষানীতি জোর দিয়েছে শিক্ষার ভারতীয়করণের ওপর। এতে বলা হয়েছে, "ভারতীয় জ্ঞান-এর মধ্যে থাকবে প্রাচীন ভারতের জ্ঞান ও আধুনিক ভারতে সেই জ্ঞানের অবদান এবং তার সাফল্য ও সমস্যা এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে ভারতের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য। বিদ্যালয় পাঠক্রমের যে কোনও অংশে, যেখানেই প্রাসঙ্গিক মনে হবে, সেখানেই এই উপাদানগুলি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বিশেষত, ভারতের মূলনিবাসীদের জ্ঞানভাণ্ডার সমেত ভারতীয় জ্ঞান ব্যবস্থা, এবং দেশীয় ও ঐতিহ্যবাহী শিক্ষার ধারার অন্তর্ভুক্ত থাকবে গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন, যোগশাস্ত্র, স্থাপত্যবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, কৃষি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য, ক্রীড়া, এমনকি শাসনপ্রক্রিয়া, রাষ্ট্রব্যবস্থা, সংরক্ষণ। সবকিছুর মধ্যেই মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ভারতীয় জ্ঞান ব্যবস্থা নিয়ে একটি চিত্তাকর্ষক কোর্স ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে রাখা হবে" (৪.২৭. জাতীয় শিক্ষানীতি চূড়ান্ত নথি)। নৈতিক বিচার, ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় নৈতিকতা এবং প্রাথমিক মানবিক ও সাংবিধানিক নৈতিকতা সমস্ত ছাত্রছাত্রীর মধ্যে বিকশিত করা হবে। শিশুদের পঞ্চতন্ত্র, জাতক, হিতোপদেশ এবং এরকম অন্যান্য উপকথার মূল গল্প, ভারতীয় ঐতিহ্যের উদ্দীপক গল্পগুলি ও পৃথিবীর সাহিত্যক্ষেত্রে তাদের প্রভাব সম্পর্কে জানার সুযোগ দেওয়া হবে।

বর্তমানের যে আধুনিক ভৌগোলিক সীমানাকে আমরা ভারত ভূখণ্ড হিসেবে জানি, সেই ভারতে প্রাচীনকালে গণিত, চিকিৎসাবিদ্যা, অস্ত্রোপচার, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি ঘটেছিল এবং বিশ্ব দরবারে তার অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান দেখা দিয়েছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে ভারতের সঙ্গে জ্ঞান ও চিন্তার আদানপ্রদান ঘটেছিল গ্রিস, মিশর, ব্যাবিলন (বর্তমান ইরাক), চীন দেশের সঙ্গে। জ্ঞানের ধারা ও প্রভাব বিস্তার ঘটেছিল দু'তরফেই। তাই আমাদের শিশুদের শুধু ভারতের অবদান ও তার প্রভাব সম্পর্কে জানালে তা নিতান্তই একপেশে জ্ঞান হয়ে যায়। জাতীয় শিক্ষানীতির নির্দেশিকা শুধুই প্রাচীন ভারতের অবদানের কথা বলে। এ হল শিশুদের অন্যান্য সভ্যতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখার হীন প্রচেষ্টা, যা শিশুদের চিন্তাশক্তির বিকাশে বাধা সৃষ্টি করবে ও তাদের মধ্যে অন্ধতা ও ধর্মান্ধতার বীজ বপন করবে। আমাদের প্রাচীন অতীতের মিথ্যা মহত্ত্ব প্রচার পূর্বপুরুষদের প্রতি ও তাদের প্রকৃত অবদানের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন ছাড়া আর কিছু নয়। অন্যদের অবদানকে ছোটো করে দেখানো অনৈতিকতা ও ধর্মান্ধতার পরিচায়ক। পাঠক্রমের এই ধারা গণতান্ত্রিক শিক্ষার মূলনীতির বিরোধী, যা মনে করে শুধুমাত্র আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও পরীক্ষিত তথ্যই পাঠক্রমের অংশ হওয়া উচিৎ। প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রকৃত অগ্রগতির দিকটি বাদ দিয়ে বিজেপি সরকার অন্ধতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন তার অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক দিকটিকেই তুলে ধরছে এবং তাকেই ঐতিহ্য বলে চালাতে চাইছে। জাতীয় শিক্ষানীতি সেই পুরনো বিচারধারা, প্রাচীন অনুন্নত বিজ্ঞান, গণিত, মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা চালু করতে আগ্রহী। আধুনিক বিজ্ঞানের বিষয়গুলিতে অবৈজ্ঞানিক ও অস্পষ্ট শিক্ষার এই ধারার অনুপ্রবেশ ঘটলে তা শুধুই অন্ধতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি, মধ্যযুগীয় মানসিকতাকেই প্রশ্রয় দেবে মাত্র এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানার্জনে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। এর ফলে রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জ্যোতিবারাও ফুলে সহ ভারতের নবজাগরণের পথিকৃৎদের দ্বারা প্রচারিত বৈজ্ঞানিক, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাধারার বিকাশ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যাবে। এটা পরিষ্কার যে জাতীয় শিক্ষানীতি কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতাসীন দলের আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং তা আমাদের নবজাগরণ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবময় ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে।

২০) জাতীয় শিক্ষানীতির সুপারিশ অনুযায়ী তারা স্থানীয় স্তরে স্কুল কমপ্লেক্স-এর মাধ্যমে কিছু শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে এবং বিএড- এর পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে একটি স্বল্প সময়ের সার্টিফিকেট কোর্স / ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা করবে। অর্থাৎ কলেজ এবং স্কুলগুলোতে চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে সরকার স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে হাত গোটাতে চাইছে।

২১) জাতীয় শিক্ষানীতিতে তিন ধরনের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে— রিসার্চ ইউনিভার্সিটি, টিচিং ইউনিভার্সিটি এবং অ্যাকাডেমিক কলেজ। এই ব্যবস্থায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তার অধীনস্থ কলেজগুলির যে শিক্ষাগত যোগাযোগ থাকে তা বিঘ্নিত হবে। যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শাখাবিহীন কাণ্ডে এবং কলেজগুলি শিকড়বিহীন গাছে পরিণত হবে এবং শিক্ষার কেন্দ্রীকরণে এই নীতি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

২২) জাতীয় শিক্ষানীতির সুপারিশ অনুযায়ী, একজন শিক্ষার্থী বিভিন্ন উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে অর্জিত ক্রেডিটগুলি একটি ব্যাংকে জমা করে রাখতে পারবে, যাকে তারা বলছে একাডেমিক ব্যাংক অফ ক্রেডিট। এই দেউলিয়া নীতি শুধুমাত্র শিক্ষাকে ব্যবসায় পরিণত করার ক্ষেত্রে সহায়ক। এই ব্যবস্থা শিক্ষার্থীর পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জনে সহায়ক তো নয়ই, বরং একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে সুবিধাবাদী মনোভাবের জন্ম দেবে।

২৩) জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য প্রসঙ্গে সরকার বলছে, এই শিক্ষানীতি ছাত্রদের মধ্যে মৌলিক কর্তব্যবোধ এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। শিক্ষক শিক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, সমস্ত বিএড কোর্সগুলি মৌলিক কর্তব্যের চর্চায় জোর দেবে। কিন্তু জাতীয় শিক্ষানীতি কোথাও মানুষের মৌলিক অধিকার নিয়ে একটি শব্দ খরচ করারও প্রয়োজন বোধ করেনি। যেখানে দেশের সরকারের উচিত শিক্ষক এবং ছাত্রদের নিজেদের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সজাগ করা, যেখানে নীতিনির্ধারকদের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য হল, সরকার যাতে দেশের নাগরিকদের তাদের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে, তা গুরুত্ব দিয়ে দেখা, সেখানে আজকের 'আত্মনির্ভর ভারতে' মৌলিক অধিকারের প্রসঙ্গ জাতীয় শিক্ষানীতিতে সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

'শক্তি ধরে যে তাকে সজাগ করো কর্তব্যে আজ
দুর্বলকে আজ জাগিয়ে তোল দিয়ে অধিকারের পাঠ,
তুমি জ্ঞানী তুমি সত্য, ইহাই তোমার কাজ ...' — বিশিষ্ট কবি সুব্রহ্মন্যভারতীর এই কথাগুলো কি আজ প্রাসঙ্গিক নয়?

২৪) জাতীয় শিক্ষানীতিতে জাতীয় গবেষণা সংস্থা এনআরএফ প্রতিষ্ঠার দিকনির্দেশ করা হয়েছে। ইউজিসি, ডিএসটি, আইসিএআর, আইসিএমআর, ডিবিটি, ডিএই ইত্যাদি সরকারি অর্থ সরবরাহকারী সংস্থাগুলোকে বন্ধ করে এনআরএফ প্রতিষ্ঠার দ্বারা আইআইটি, এনআইটি, জেএনইউ-এর মতো কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কফিনে শেষ পেরেক পোঁতা হবে। পাশাপাশি শিক্ষা-মাফিয়াদের দ্বারা পরিচালিত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে ফুলেফেঁপে ওঠার সুযোগ করে দেওয়া হবে। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় সংস্থার দ্বারা পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান— সব ধরনের প্রতিষ্ঠানকে একই মানদণ্ডে দেখতে হবে এবং একইভাবে উৎসাহ জোগাতে হবে। গবেষণার ক্ষেত্রে অনুদানের প্রশ্নে তারা বলছে, 'সরকারি সংস্থার পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা, সমাজসেবামূলক সংগঠনগুলিও 'তাদের ইচ্ছে ও প্রয়োজনের পরিপূরক' গবেষণাতে 'ব্যক্তিগতভাবে' অনুদান দিতে পারবে। শিল্পগোষ্ঠী বা বেসরকারি মালিক গোষ্ঠী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত অনুদান ব্যবস্থা সামাজিক প্রয়োজনে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করে কেবলমাত্র প্রযুক্তিগত গবেষণাকে উৎসাহিত করবে, যা বাস্তবে মৌলিক গবেষণা ও সামাজিক সমস্যার মতো বিষয়ের উপর গবেষণার মৃত্যু ডেকে আনবে।

২৫) এই শিক্ষানীতি মেডিকেল শিক্ষা কোর্স, কারিকুলাম, পরীক্ষা পদ্ধতিতে যে সর্বাত্মক পরিবর্তনের প্রস্তাব এনেছে তা মেডিকেল শিক্ষাকে সামগ্রিকভাবে অবনমনের রাস্তার দিকে ঠেলে দেওয়ার পাশাপাশি এই শিক্ষায় বেসরকারিকরণের অবারিত দ্বার খুলে দেবে। শিক্ষানীতিতে 'আয়ুষ' নামে পাঁচটি পুরনো চিকিৎসা পদ্ধতিকে এমবিবিএস কোর্সে যুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই পাঁচটি চিকিৎসা পদ্ধতি হল আয়ুর্বেদ, যোগ, নেচারোপ্যাথি, সিদ্ধা ও হোমিওপ্যাথি। একজন এমবিবিএস ছাত্রকে চিকিৎসাশাস্ত্রের এতগুলি বিভাগ বা সিস্টেম অফ মেডিসিন অধ্যয়ন করতে বাধ্য করা একেবারেই অবৈজ্ঞানিক। কারণ এগুলির প্রত্যেকটির পড়াশোনা এবং চিকিৎসা পদ্ধতি অন্যটি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সরকারের যদি সত্যিই আয়ুষ বিভাগকে উন্নত করার সদিচ্ছা থাকে, তাহলে তাদের উচিত এতে ফান্ডিং বাড়িয়ে এ সংক্রান্ত গবেষণাকে উৎসাহিত করা। এর সাথে মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া বা এমসিআই-কে ভেঙে সরকার ইতিমধ্যেই ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন বা এনএমসি বিল এনেছে যা মেডিকেল শিক্ষার কেন্দ্রীকরণ ও আমলাতান্ত্রিক পরিচালনাকে আরও শক্তপোক্ত করবে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com